হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র জীবন ও কারামত

মোল্লা আলী কারী হানাফী
[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

Scanned by CamScanner

Click Here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ

(আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর)

نزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عبد القادر

হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র জীবন ও কারামত

মূল

রঈসুল মুহাদ্দিসীন হযরত মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন

১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Scanned by CamScanner

হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র জীবন ও কারামত
মূল : রঈসুল মুহাদ্দিসীন হযরত মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ.)
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
সনজরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

প্রথম প্রকাশ : ১২ আগষ্ট ২০১০, ১ রমযান ১৪৩১, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৭

মূল্য : ১২০ [একশত বিশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সনজরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Hazrat Abdul Kader Jilanir Jibon & Karamot, By: Allamah Mulla Ali Kari. Translated By: Muhammad Nezamuddin. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 120/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
وَ الآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
أَهْلُ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
গাউসুল আযম ও কাদেরিয়া তরীকা	২
পবিত্র বংশ	১৩
মাতুলালয়	১৫
মাশ্‌রাব বা মাযহাব	১৬
সন্তান–সন্ততি ও নাতি–নাত্‌নী	১৭
সন্তান–সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষা	১৯
নাতি ও দৌহিত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা	২০
শারীরিক গড়ন এবং জ্ঞান অর্জন	২৩
রচনাবলী	২৫
জন্মস্থান গীলান	২৫
খিলাফত অর্জন	২৭
অমীয় বাণী	৩০
তাওবা ও তাক্‌ওয়া সম্পর্কে কতেক আরিফদের বাণী	৩৩
রোযার আদব ও গাউসুল আযমের উক্তি	৩৫
মুহীউদ্দীন (দ্বীনের পুনর্জীবিতকারী) উপাধির কারণ	৪২
হযরত শায়খ আবু মাদ্‌ইয়ান শু'আইব এবং হযরত গাউসুল আযম	৪৩
প্রথম হজ্ব	৪৩
ইরাকের মরুপ্রান্তরে হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাৎ	৪৬
খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহর উপস্থিতি	৪৭
আবু গালিব এবং হযরত গাউসুল আযম	৪৮
কতেক শিয়া কর্তৃক পরীক্ষা	৪৯
এক অনারবীয় কাফেলাকে সাহায্য	৫০
নিশিরাতে নিহাওয়ান্দ ভ্রমণ	৫১
একজন মেয়েকে জিন থেকে মুক্তি	৫২
এক সাহিব-ই হাল সম্পর্কে শায়খ ইবনে আলী হায়তীর সুপারিশ	৫৩
জুমা মসজিদে সাধারণ লোকের ব্যাকুলতা	৫৩
সাপ এবং হযরত গাউসুল আযম	৫৬
সাইয়্যিদ আবদুর রায্‌যাককে সুসংবাদ	৫৭
ইরাকের বড় বড় শায়খ ও আলিম তাঁর মজলিসে উপস্থিতি হওয়া	৫৮
হুযূরের মজলিসে সাহেবজাদা সাইয়্যিদ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্‌হাববের বক্তব্য	৬০
গাউসুল আযমের মজলিসে প্রিয় নবী নিজ সাহাবীসহ শুভাগমন করা	৬১
পোশাক ও খিলআত	৬২
সাক্ষাৎকারীদের সম্পর্কে সুসংবাদ	৬২
হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ এবং গাউসুল আযম	৬৩
হযরত গাউসুল আযমের খাদিমের আশ্চর্য ঘটনা	৬৩
মাদ্‌রাসা-ই বাগদাদের দ্বার হচ্ছে রহমতের দ্বার	৬৪
গাউসুল আযম থেকে সাহায্য প্রাপ্ত	৬৫
শায়খ মানসূর ওয়াসিতীর বর্ণনা	৬৫
তাঁর ওয়াজ মাহফিলের ধরন	৬৬
ইবনে সাকার ঘটনা	৬৬
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি	৬৮
কবিতাবলী	৭৩
তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফার সাথে সাক্ষাৎ	৭৪
কাকে 'কুতুব' বলা হয়	৭৭
গাউসুল আযমের কালাম	৮০
হযরত গাউসুল আযমের দৃষ্টিতে হযরত মনসূর হাল্লাজ	৮৪
ইলহাম, ওয়াস্‌ওয়াসা এবং হাওয়া	৮৫
উপদেশের দোয়া	৮৮

Scanned by CamScanner

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মাহবুব-ই সুবহানী কুতুবে রব্বানী শায়খ সাইয়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী (৪৭১-৫৬১হিঃ) ৫ম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের পতন যুগে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে কালজয়ী রূহানী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন কালের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর আদর্শের পথ ধরে সম্মানিত সূফীয়া-ই কিরাম যুগে যুগে বিশ্বের নানা প্রান্তরে ইসলামের বাণীকে মানুষের দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যান। ইসলামের চার মহান সূফী তরীকার মধ্যে কাদেরীয়া তরীকার মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবন-কর্মের উপর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। তাঁর জীবন-কর্মের উপর লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে হযরত মোল্লা আলীকারী (ওফাত- ১০১৪ হিজরী) এর 'নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাকিব-ই শায়খ আবদিল কাদির' গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং মৌলিক গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

হযরত মোল্লা আলী কারী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হিজরী ১১ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ্ , মুহাদ্দিস্ ও ওলীগণের অন্যতম। তাঁর প্রায় গবেষণাগুলো কালোত্তীর্ণ। ফলে গবেষকগণ ইলমে হাদিস ও ফিক্হায় তাঁর অভিমতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবন-সাধনার উপর রচিত তাঁর এ পুস্তিকাটি তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর।

কোন অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই অত্যন্ত সরল-সোজাভাবে তিনি এ পুস্তকে হযরত গাউসুল আযমের জীবন ও আদর্শকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। তরীকত ও তাসাউফের প্রকৃত শিক্ষাকে তিনি এ গ্রন্থে সুন্দর ও সার্থকভাবে উপস্থাপন করেন, ফলে হযরত গাউসুল আ'যমের আদর্শের পতাকাধারী বা প্রকৃত কাদেরীদের কাছে এ পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। পুস্তকটি আরবী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে এ দেশের অগণিত গাউসুল আযমের প্রেমিকগণ উপকৃত হতে পারছেন না বিধায় আমরা অনুবাদ করার উদ্যোগ নিই। অতি অল্প সময়ে পুস্তকটির অনুবাদ করেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন। পুস্তটির সংগ্রহ, অনুবাদ, কম্পোজ ইত্যাদি কাজে যারা অবদান রেখেছেন আমি সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কারো কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানিয়ে ধন্য করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ্।
আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, আমীন।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্জরী পাবলিকেশন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

پیر پیراں میر میراں اے شاہ جیلاں توئی
انس جان قدسیاں وغوثِ انس و جاں توئی

(পীরে পীরাঁ মীরে মীরাঁ আয় শাহে জীলাঁ তুয়ি
ইন্স জানে কুদ্সিয়া ও গাউসে ইনসো জাঁ তুয়ি)

(আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ.)

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

॥ এক ॥

হিজরী এগার শতাব্দীতে যেসব সম্মানিত আলেম ও ফকীহগণ স্বীয় ইলম, আমল, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দ্বারা ইসলামের বিশ্বজনীন অবদানকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন তাঁদের মধ্যে মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে, আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী, আল হারাভী, আল-মক্কী, আল-হানাফী। ইলমী জগতে তিনি 'মোল্লা আলী কারী' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি 'হারাত'এ জন্মগ্রহণ করেন। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। শিক্ষার্জন শেষে পুরো জিন্দেগী ইলমের খিদমতে মক্কা শরীফে অতিবাহিত করেন। ইলম বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষত ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহ্য় তিনি যুগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কুরআন, তাফসীর, হাদিস, ফিকহ্, আকাইদ, কালাম, জীবনীসহ প্রায় এক শতের উপরে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু শাফি'ঈ মতালম্বী ব্যতীত তাঁর যুগের সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ তাঁর রচনাবলীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। এবং তাঁর পরবর্তী প্রায় সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ নিজেদের গবেষণায় তাঁর অভিমতকে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবীহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতীহ' ইসলামী বিশ্বে যে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে তা অন্য কোন কিতাবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রতিটি যুগের আলিমগণ 'মিরকাত' পড়ে মোল্লা আলী কারীর ইলমে যোগ্যতাকে এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হন। তাঁর মূল্যবানধর্মী রচনাবলীর কারণে তিনি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)এর মর্যাদায় ভূষিত হন। ১০১৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে মক্কা শরীফ তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাকিবি শায়খি আবদিল কাদির'- গ্রন্থটি হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধার এক অনন্য উপহার। হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবন-কর্ম ও কামালাতের উপর অনেক ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ-পুস্তক লেখা হয়েছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ গ্রন্থটিতে হযরত গাউসুল আযম'র জীবন, কর্ম ও কামালাতকে

খুবই সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করেন। ফলে গ্রন্থটি গবেষকদের কাছে ব্যাপক সমাদৃত। মূল কিতাবটি আরবী ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ মহান পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। খুবসম্ভব এটাই এ গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদ। পাকিস্তান লাহোরস্থ 'মারকায-এ মজলিস-ই রিযার চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট উর্দু লেখক, অনুবাদক ও গবেষক পীরজাদা আল্লামা ইকবাল আহমদ ফারুকী (এম.এ) পুস্তকটির উর্দু অনুবাদ করেন। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা তাঁর উর্দু অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি-এ জন্য আমরা তাঁর শোকরিয়া আদায় করছি। মূল পুস্তক পর্যালোচনার পূর্বে 'হযরত গাউসুল আযম ও কাদেরিয়া তারীকা'র উপর কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস রাখি।

॥ দুই ॥

গাউসুল আযম ও কাদেরিয়া তরীকা

'ইসলাম' এমন এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান ও দর্শন, যাতে মানুষের বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মানুষের বস্তবাদ হচ্ছে 'শরীয়ত' আর আধ্যাত্মবাদ হচ্ছে 'তাসাউফ' বা 'তরীকত'। একটি বৃক্ষের শিকড়, গুঁড়ি, পত্র-পল্লব ইত্যাদি ওই বক্ষের বাহ্যিক দিকের পরিচয় বহন করে এবং সেজন্য তা ওই বৃক্ষের 'শরীয়ত'। আর ওই বৃক্ষের ফুল, ফল ও জীবনীশক্তি হচ্ছে ওই বৃক্ষের 'তাসাউফ' বা তরীকত। বৃক্ষের শিকড়, গুঁড়ি, শাখা-প্রশাখা না থাকলে যেমন ফুল, ফল ও ওই বৃক্ষের জীবন অসম্ভব, অলীক ও আকাশকুসুম সদৃশ, তেমনি শরীয়ত ব্যতীত তরীকত (তাসাউফ)-এর কল্পনা করা যায় না। তাই শরীয়ত হচ্ছে তরীকতের ভিত্তিমূল। শরীয়ত দেহ আর তরীকত আত্মা বা প্রাণ। আত্মারূপ তরীকত ও দেহরূপ শরীয়ত এ দু'য়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা একজন প্রকৃত মুসলমানের জীবনে অপরিসীম। এ জন্য একজন প্রকৃত তরীকতপন্থীর জীবনে শরীয়ত ও তরীকত সমভাবে ক্রিয়াশীল।[১] তরীকত বা তাসাউফ সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গড়ে না উঠলেও প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই এটার উৎপত্তি ও সূচনা। ফলে প্রতিটি তরীকা বা সিলসিলাহ্'র শায়খ বা পীরগণের ক্রমাণুসারী তালিকায় সর্বাগ্রে উল্লেখিত হয়েছে প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা

১. শরীয়ত ও তরীকত একটি অপরটির পরিপূরক। এতদবিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'মাক্বা-লু 'উরাফা-বি ই'য়া-যি শর'ঈ ওয়া উলামা' গ্রন্থখানা দেখুন।

Scanned by CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মুবারক। বিভিন্ন তরীকার নিয়ম-কানুন এবং আধ্যাত্মিক সুলূক ও তালীমের সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ যে রূপ আমরা বর্তমানে দেখতে পায়, তার সূচনা মূলত খ্রিষ্টীয় ১০ম শতাব্দির দিকে। ফলে অনেকেই তরীকত বা তাসাউফকে ইসলামের মধ্যে নতুন মতবাদ বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালায়। মূলত হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তরীকতের যে কল্যাণধারা চলে আসছে, তা ১০ম শতাব্দিতে এসে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ শাস্ত্র ও প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোপূর্বে সূফীদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ওই ধারা মুখে মুখে চলে আসছিল।[২] হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী এ মাযহাব চতুষ্টয়ের পূর্বে যেমন একাধিক ইমামের নামে বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে এ চার মাযহাবের মধ্যেই শরীয়তের আলোচনা, অনুশীলন ও চর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনিভাবে ইসলামের আধ্যাত্মক্ষেত্রেও বিভিন্ন তরীকা বা সূফীসংঘের উদ্ভব হয়, যা পরবর্তীতে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দিয়া (মুজাদ্দেদিয়া), সোহরাওয়ার্দিয়া এ চার তরীকায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। তন্মধ্যে অনেক তরীকা এমনও ছিল, যা মূল ইসলামী শরীয়ত থেকে দূরে সরে পড়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়, অথবা কোন কোন তরীকা অন্য বড় প্রভাবশালী তরীকার সাথে মিশে এক হয়ে যায়। সবগুলো তরীকার মধ্যে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও নকশবন্দিয়া– এ চারটি তরীকা ৪০০ হিজরীর শেষে এবং ৫০০ হিজরীর প্রারম্ভে মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের জ্ঞানগত ও রূহানী জগতে যে বিপ্লব সাধন করেছে তা ইতিহাসের এক স্বর্ণালী অধ্যায়। এ প্রসিদ্ধ চার তরীকার মধ্যে 'কাদেরিয়া তরীকা' হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৫৬১ হি.), সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকা হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৬৩২ হি.), 'চিশতিয়া তরীকা' সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৬৩২ হি.) আর 'নক্শবন্দিয়া তরীকা' হযরত খাজা বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নক্শবন্দী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত : ৭৯১ হি.)'র পবিত্র নামের সাথে সম্পৃক্ত। তরীকতজগতে ওই প্রসিদ্ধ চার তরীকার মধ্যে 'কাদেরিয়া তরীকা' হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন তরীকা। কারণ, তরীকতের সবচেয়ে প্রাচীন ও আদি তরীকা 'তরীকাহ্-এ

[২]. চৌধুরী শমসুর রহমান, 'সূফীদর্শন' পৃ. ৭৭-৭৮

জুনাইদিয়া'র সাথে এটার সম্পর্ক। হযরত গাউসে পাক রাহমতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে এ তরীকা হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি (২১৮-২৯৭ হি.)'র নামানুসারে 'সিলসিলাহ্- এ জুনাইদিয়া' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির নামানুসারে এ তরীকা 'সিলসিলাহ্-এ আলিয়া কাদেরিয়া' নামে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৩]

বর্তমান বিশ্বে লাখ লাখ মুসলমান এ তরীকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশে কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী সবচেয়ে বেশি। কারণ, কাদেরিয়া তরীকা আল্লাহ তা'আলার নূর ও তাজাল্লিয়াতের এমন এক প্রস্রবণ, যা থেকে অপরাপর তরীকাগুলো সিক্ত হয়েছে।

চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও নকশবন্দিয়া প্রভৃতি তরীকা এ কাদেরিয়া তরিকার পুষ্পোদ্যান থেকে ফুল কুড়িয়ে নিজেদের আঁচল ভর্তি করেছে। প্রতিটি প্রসিদ্ধ তরীকার প্রতিষ্ঠাতাণ কাদেরিয়া তরীকার মহান প্রতিষ্ঠাতার সাহচর্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে বরকত ও ফুয়ূযাত অর্জনে ধন্য হয়েছেন। এ মহান তরীকার অনুসারীগণও অন্যন্য তরীকার অনুসারীদের থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাই কাদেরিয়া সিলসিলার মুরীদের জন্য অন্য সিলসিলাহ্ বা তরীকায় দীক্ষাগ্রহণ করা অনুচিত। হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী কাদেরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'তোহফা-এ কাদেরিয়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, "শায়খ আবুল বারাকাত মূসলী তাঁর চাচা হযরত 'আদী ইবনে মুসাফির থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলতেন, যে কোন তরীকার মুরীদগণ আমার কাছে তরীকতের দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে, আমি তাঁকে আমার তরীকায় দাখিল করে নিই। কিন্তু শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদগণকে এ সুযোগ দিই না। কারণ, তাঁরা এক অনন্ত কুল-কিনারা বিহীন রহমতের সমুদ্রের মাঝে ডুবে আছে। তাঁদের অন্য কোন তরীকার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁরা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করবেই বা কেন? কারণ কেউ সমুদ্র ত্যাগ করে পুকুরের নিকট আসেনা। যে জান্নাত-এ 'আদনে অবস্থান করে বাগান দিয়ে সে কী করবে?"[৪]

[৩]. শামস বেরলভী আল্লামা, গুনিয়াতুত তালিবীন (উর্দু সংস্করণ)-এর ভূমিকা, (ফারুকিয়া বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত) পৃ. ২২

[৪]. আবদুল মুজতবা রেজভী মাওলানা, তাযকিয়ায়ে মাশায়েখে কাদেরিয়া বারকাতিয়া রেজভিয়া, (ইউ পি, ভারত, আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া ১৯৯৬) পৃ. ২৪

Scanned by CamScanner

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাঁর প্রবর্তিত তরীকার মাহাত্ম্য বর্ণনায় হযরত সুলতান বাহূ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেছেন, "যে কোন তরীকতপন্থী যত রিয়াযত-মুজাহিদাহ্ করুক না কেন, একজন সামান্য মর্যাদার অধিকারী কাদেরী তরীকতপন্থীর মর্যাদায়ও পৌঁছতে পারে না। কারণ, কাদেরীগণ স্বল্প সময়ে যে মক্বাম বা স্তরে পৌঁছতে পারে, অন্যরা ওই স্তরে পৌঁছতে অনেক মুজাহিদার প্রয়োজন হয়।"[৫]

সারা বিশ্বে 'কাদেরিয়া তরীকা'র ব্যাপক পরিচিত ও প্রচার-প্রসার লাভ করার পেছনে হুযূর গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি তো আছেই, সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, শরীয়ত ও তরীকতের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারে হুযূর গাউসে আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর স্বতন্ত্র ও সর্বোচ্চ মর্যাদা। তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী তরীকতের পীর-মাশাইখ থেকে ইসলাম প্রচারে তাঁর নিয়ম-পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনি একাকী নির্জনবাসী ও সংসারবিরাগীও ছিলেন না। তিনি যদি তাই হতেন, তবে তাঁর এ মিশন এতো কামিয়াব হতো না। তিনি বড় সাহসীকতার সাথে সর্বসাধারণের জন্য স্বীয় মজলিস উন্মুক্ত রাখেন। যা কিছু বলেছেন প্রকাশ্যে বলেছেন। কোন রাজা-বাদশাহ ও বড়লোকের রক্তচক্ষু এবং উন্মুক্ত কৃপাণের ভয়ে সত্যের উচ্চারণে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন, এতে ইশারা-ইঙ্গিতের আশ্রয় নেন নি। তাঁর যুগের রাজা-বাদশাহ্ ও আমীর-উমারাদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর একেকটি বক্তব্য ও ভাষণ মানুষের চিন্তারাজ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ্যের মজলিসে তাসাউফের নিগূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব নিয়ে তিনি বেশি আলোচনা করতেন না। বরং তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল মানুষের মাঝে পবিত্র কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামের সহজ-সরল জীবনপদ্ধতি তুলে ধরা এবং প্রত্যেক প্রকারের ত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রতি। বাদশাহ ও আমীর-উমারাদের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল, জনগণের প্রতি অন্যায়-অবিচার করার থেকে বিরত থেকে ইনসাফভিত্তিক

[৫]. ড. গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম, তারিখে মাশায়েখে কাদেরিয়া (কুতুবখানা আমজাদিয়া, মাটিয়ামহল, জামে মসজিদ, দিল্লী, ভারত) ১ম খন্ড, পৃ.-৬০

সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার। আলিম ও সূফীগণের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল, তাঁরা যেন লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজ তাকওয়া-পরহেযগারী বিক্রি না করেন।

আলিমগণকে উপদেশ দিয়েছেন- তাঁরা যেন গর্ব-অহংকার, আমিত্ব, লোভ-লালসা এবং লৌকিকতা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখেন। প্রায় সময় তিনি তাঁর বক্তব্যে এ কথা বলতেন- "আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (কুসংস্কার) সৃষ্টি করো না। আনুগত্য কর, নাফরমানী কর না। ধৈর্যধারণ কর, অধৈর্য হয়ো না। প্রত্যেক কঠিনের পর রয়েছে সহজ এবং স্বীয় লক্ষ্য সাধনের অপেক্ষায় থাক। নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর স্মরণে অবিচল থাক। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। গুণাহ্ থেকে তাওবা করে পবিত্র হয়ে যাও এবং আপন মালিকের দরজা পরিত্যাগ করো না।"[৬]

হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তাসাউফ দর্শনে দুনিয়া বিমুখীতা এবং বৈরাগ্যের শিক্ষা কখনো দেননি। বরং তিনি এ কথার উপর জোর দিয়েছেন যে, মানুষ যেন নিজেদেরকে দুনিয়াতেই সংশোধন করে নেয়, যাতে পরকালের পাথেয় অর্জন সম্ভব হয়। তাঁর তরীকতদর্শনের সারমর্ম হচ্ছে- সর্বাগ্রে তোমার প্রয়োজন অনুসারে শরীয়তের ইলম অর্জন কর এবং তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদনুযায়ী আমল কর। অতঃপর আমলকে হালে[৭] পরিণত কর। আর তোমার অবস্থা এভাবে গঠন কর যে, ইবাদতের মহব্বত তোমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় দৃঢ়ভাবে বসে যায় এবং তখন ইবাদতকার্য পরিত্যাগ করা এমন কষ্টকর হয়ে উঠে, যেমন প্রথম অবস্থায় এটা সম্পাদন করা কষ্টকর ছিল।[৮]

তিনি আরো বলেছেন, "বাতেনী রাজ্যের বিভিন্ন পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সকলের একচ্ছত্র অভিভাবক হচ্ছেন নবী সম্রাট হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে পদ এবং যে পুরস্কার পেয়ে থাকেন, তা কেবল রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদৌলতেই পেয়ে থাকেন। সুতরাং জেনে

[৬]. শাম্স বেরলভী আল্লামা, গুনয়াতুত তালিবীন (উর্দূ সংস্করণ)-এর ভূমিকা, (ফারুকিয়া বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত) পৃ. ২৪

[৭]. আল্লাহ তা'আলার সাথে তরীকতপন্থীর সম্বন্ধ মজবুত হয়ে গেলে তার হৃদয়ে যে প্রভাব প্রতিফলন হয়, তাকেই 'হাল' বলে।

[৮]. আবদুল খালেক, গাউসে আযম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) ১৯৯১ ইং, পৃ. ১৮০-১৮২

Scanned by CamScanner

রাখ, যে ব্যক্তি সুন্নাতের গণ্ডি হতে ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। আর যে তরীকতের সাথে শরীয়তের একটি আদেশেরও বিরোধ থাকে, এমন তরীকত অনুসরণ করে চললে 'সিদ্দীক' (অকপট পরম ধার্মিক) না হয়ে 'যিন্দীক' (বেঈমান) হতে হয়।"[৯]

বর্তমান অনেক তরীকতের শায়খ (পীর)কে দেখা যায়, যারা শরীয়তের ইলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেকে তো শরীয়তের বিধি নিষেধও মেনে চলে না। অথচ তরীকত জগতের সম্রাট হুযূর গাউসে আযম শাহানশাহে বাগদাদ সাইয়্যিদুনা আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "সর্বাগ্রে শরীয়তের ইলম (জ্ঞান) অর্জন কর, তৎপর নির্জনতা অবলম্বন কর। কারণ, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন না করে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়, সাধারণত এমন ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের লোকের ইবাদত বরবাদ হয়ে যায়। অতএব, সর্বপ্রথম শরীয়তের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর এবং তারপর আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যিক্‌র-আয্‌কারের প্রতি মনোনিবেশ কর। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তার ইলম বৃদ্ধি করে দেন এবং বাতেনী ইলম দান করেন।"[১০]

সুতরাং কাদেরিয়া তরীকার শিক্ষা ও আদর্শ শরীয়তের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে সাধারণ লোকের চেয়ে আলিম-ওলামা, জ্ঞান-গুণী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই তরীকতের সাথে বেশি সম্পৃক্ত দেখা যায়। সবার কাছে এই তরীক্বতের গ্রহণযোগ্যতা প্রাধান্য পায়।

॥ তিন ॥

শরীয়ত ও তরীকতের মহান দিকপাল, ওলীকুল সম্রাট, কাদেরীয়া তরীকার প্রবর্তক হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর শিক্ষা ও আদর্শ যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে আসছে। চিশতীয়া, ওয়ায়সীয়া, রিফাঈয়া, মাওলাভীয়া, শাযিলীয়া, শাত্তারীয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া সহ প্রভৃতি তরীকা হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত আছে। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানদের

৯. আবদুল খালেক, গাউসে আযম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) ১৯৯১ ইং, পৃ. ১৮২
১০. আবদুল খালেক, গাউসে আযম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা) ১৯৯১ ইং, পৃ. ১৭২

উপর করুন ও লোমহর্ষক অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার যুগসন্ধিক্ষণে গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ পরিত্রাণ লাভ করে। গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর এ অসামান্য অবদানকে স্বীকার করতে গিয়ে যুগে যুগে উম্মতের ওলামা, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও প্রখ্যাত লেখকগণের অনেকেই তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর জীবন ও কর্মের উপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবী ভাষায় যে সমস্ত মহান মনীষী তাঁর জীবনের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো হলো এ যে,

১. নূরুন নাযির ফী আখ্‌বার-ই-শায়খ্ আবদিল কাদির কৃত, আল্লামা আবু বকর আব্দুল্লাহ তামীমী ইরাকী।
২. বাহ্‌জাতুল আস্‌রার কৃত, আল্লামা নুরুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন য়ুসুফ শাতনূফী।
৩. দুরারুজ জাওয়াহির ফী মানাকিবি শায়খি আবদিল কাদির কৃত, আল্লামা সিরাজ উদ্দীন আবু হাফস উমর বিন আলী।
৪. রা'সুল মাফাখির ফী মানাকিবিশ শায়খি আবদিল কাদির কৃত, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনিস সা'আদ শাফি'ঈ।
৫. রাওজাতুন নাযির ফী মানাকিবিশ শায়খি আবদিল কাদির কৃত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজবাদী।
৬. আর রাওযুয যাহির ফী মানাকিবিশ শায়খি আবদিল কাদির কৃত, আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ কোছতালানী 'মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া' প্রণেতা।
৭. নুয্‌হাতুল খাতিরিল ফাতির ফী মানাবিকিশ শায়খি আবদলি কাদের কৃত, মোল্লা আলী কারী হানাফী, মিরকাত প্রণেতা।

এছাড়া উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী, বাংলায় তাঁর জীবনের উপর এতো সংখ্যক্ষ গ্রন্থ রচনা হয়েছে- যার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের অজানা। ১৯১৩ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' এ হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বিশ্বব্যাপী অবদানকে পাশ্চাত্য মনীষীগণ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই এ মহান মনীষীর অসামান্য অবদানকে স্বীকার করতে রাজী নয়। অথচ যুগে যুগে এ সমস্ত আল্লাহর পূণ্যাত্মা বান্দাদের ত্যাগ ও সংগ্রামের বদৌলতে ইসলামের মর্মবাণী আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারে কাদেরীয়া তরীকার শায়খগণের অবদান অগ্রগণ্য।

Scanned by CamScanner

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এমন সময়ে বাগদাদে গমন করেন যখন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের পতনের যুগ আরম্ভ হয়। যদিও বাহ্যিকভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য সুদূর স্পেন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভেতরকার অবস্থা এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আল্লামা সুয়ূতী, শিবলী নুমানী, সৈয়দ সুলায়মান নদভী ও ইবনে জাওযী প্রমুখ ঐতিহাসিক সে যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সারমর্ম হলো এ যে, তখন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিকসহ সর্বক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। এমন কি মুসলিম জগতের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দর্শনে ইমাম গায্যালী (৪৫২-৫০৫হিঃ) এর মত মহান ব্যক্তিত্ব চরম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটান। শেষ পর্যন্ত তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্‌রাসার তাঁর গৌরবজনক পদমর্যাদা ত্যাগ করে পরিব্রাজক দরবেশরূপে গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং নির্জনবাস অবলম্বন করেন। এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু খোদা প্রদত্ত রূহানী ও ইলমী শক্তিবলে ইসলামের ডুবে যাওয়া তরীকে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং জটিল ইসলামী তথ্য ও তাত্ত্বিক সমাধানকল্পে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমূল্য বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা দানে ইসলামের আসল রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিধি, অকাট্যযুক্তি, ভাষার লালিত্য, বাগ্মিতা, গতিময় বাচনভঙ্গির মাধ্যমে অধঃপতিত মানব সমাজকে তিনি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। শুধু তাঁর বক্তব্য শুনার জন্য খলিফা-বাদশা হতে আরম্ভ করে দরিদ্র শ্রেণী এমনকি ইয়াহুদী, নাসারা, কাফের-মুশরিকসহ সমাজের সর্বস্তরের লোক যোগদান করত এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিত। ইতিহাস পাঠে যে জিনিসটা আমাদেরকে হতবাক করে তুলে তা'হলো এ যে, হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী বিশ্বে এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলে তাঁর আঙ্গুল হেলনে উঠতো আর বসত, আব্বাসীয় সালতানাত ছিল নামেমাত্র সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা। মূলত তখন বাগদাদের সকলে হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকেই নিজেদের সর্বেসর্বা

বলে মনে করতো। শুধু তা'নয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকা-ই-কাদেরীয়া'র শায়খগণ যুগে যুগে ইসলামের পূণর্জাগরণে যে অসামান্য ভূমিকা রাখেন তা কোন মুসলিম রাজা বাদশা রাখতে সক্ষম হননি। বলতে গেলে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যে সব মুসলমান অন্যায়-অবিচার তথা সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত থেকে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা পালন করছেন তাদের পেছনে যে শক্তি কার্যকর রয়েছে তা'হলো সত্যপন্থী তরীকাগুলোর শিক্ষা ও আদর্শ। খ্রিষ্টানদের ক্রুসেডের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, মুসলমানরা নিজেদের ঈমানী শক্তি ও জেহাদী প্রেরণা হারিয়ে বসেছিল তখন হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শিক্ষা প্রাপ্ত শিষ্যবৃন্দের ঈমানী শক্তি এবং জেহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নূরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ্ উদ্দীন আয়ূবীর মত দরবেশ বাদশা ইসলামী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। আর ওই সময় ভারতবর্ষে গজনী শাসনের অবসানের পর ঘোরী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর অসামান্য অবদান ছিল তিনি ছিলেন হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকটতম আত্মীয় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

সিল্‌সিলা-ই কাদেরীয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া'র এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাক্‌রীয়া মুলতানী- যাঁর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার বদৌলতে সিন্ধু ও ভারতবর্ষে ঈমান ও ইরফানের প্রদ্বীপ উজ্জ্বল হয়। আর বাংলার জমীনে এ সোহরাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দির অন্যতম খলীফা হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী ইসলামের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলারেম প্রচার-প্রসারে যে সব হক তরীকার অবদান অসামান্য সে সব তরকিার শায়খগণ প্রত্যক্ষ বা পরোপক্ষভাবে হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বেলায়তের ফরয প্রাপ্ত। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের সামনে সকলে ঋণী। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এ সিল্‌সিলার ঢঙ্কা বেলায়তের আকাশে সর্বদা বাজতে থাকবে। এ জন্য হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নিজেই বলছেন-

আফালাত শুমূসুল আওয়্যালিনা ও শাম্‌সুনা
আবাদান আলাল উফুকিল উলা লা তাগরুবু

অর্থাৎ 'পূর্ববর্তী ওলীদের বেলায়তের সূর্য অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু বেলায়তের আকাশে আমার সূর্য সর্বদা উদয়মান থাকবে।'

Scanned by CamScanner

হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার বিশ্ব জনীন অবদানের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

রাজা কিস শহর মে করতে নেহী তেরে খেদাম
বাজ কিস নহর ছে লেতা নেহী দরিয়া তেরা।
মায্‌রায়ে চিশ্‌ত ও বুখারা ও ইরাক ও আজমীর
কওন ছে কাশ্‌ত পে বর্‌সা নেহী ঝুলা তেরা।

অর্থাৎ বেলায়তের রাজ্যে সকলে আপনার সেবক, আপনার বেলায়তের সমুদ্র থেকেই সকল নদ-নদী উর্বরা। চিশ্‌ত, বুখারা, ইরাক ও আজমীরের বেলায়তের উর্বর ভূমি এমন নেই যেখানে আপনার ফয়য্‌ বর্ষিত হয়নি।

এভাবে হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু কাদেরীয়া তরীকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার-প্রসারে যেমন বিশ্বজনীন অবদান রাখেন তেমনি লেখনির মাধ্যমেও ইসলারেম মর্মবাণীকে তুলে ধরেন অনাগত মানুষের জন্য। তাঁর রচিত 'গুনিয়াতুত তালেবীন', ফত্‌হুল গায়্‌ব, ফতুহে রাব্বানী প্রভৃতি মুসলমানদের জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশে মহান নিয়ামত। তাঁর মুখ নিসৃত কাসীদা-ই গাউসিয়ার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিমালায় তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বোচ্চ মকামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ তাঁর প্রথমোক্ত গ্রন্থ 'গুনিয়াতুত তালেবীন' এর বর্ণনা শৈলীর প্রশংসা করেছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম' (১৯৬০ সালে প্রকাশিত) এর প্রবন্ধকার এ বলে মন্তব্য করেন– 'যে যুগে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আপন মিশনের কাজ সূচনা করেন তখন আপন রচিত গ্রন্থ 'আল গুনিয়াতু লিতালিবি তরীকিল হক' (প্রকাশকাল ১৩০৪ হিজরী, মিসর) এ এক বিশ্বজনীন দর্শন পেশ করে। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি একজন সুন্নী মুসলমানের চারিত্রিক, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চিত্র পেশ করেছেন। এতে হাম্বলী মতাদর্শের দৃষ্টিকোণে এমন এক জীবনাদর্শন সংকলন করেন যা জানা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এটাতে ৭৩ ফির্কারও বর্ণনা আছে। আর গ্রন্থটি 'তাসাউফ' এর রীতিনীতি বর্ণনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন।'[১১]

তাই বর্তমানে আমাদের সামগ্রিক জীবনে অবক্ষয়ের যে ধস নেমেছে এ অবস্থায় তাঁর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ এবং তরীকা-ই-কাদেরীয়াসহ সকল

[১১]. শামস্‌ বেরলভী আল্লাম, গুনয়াতুত তালিবীন (উর্দু সংস্করণ)এর ভূমিকা, ফারুকীয়া বুক ডিপো, দিল্লী, অরত, পৃ. ২৫

হক তরীকায় অন্তর্ভুক্ত হবার মাধ্যমে আমরা যদি 'ইনসানে কামিল' হতে পারি তবে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে আমাদের জন্য সহজ হবে। হুযূর গাউসে পাক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর শিক্ষা ও আদর্শের ছোয়ায় যেমন তৎকালীন আত্মবিস্মৃত, দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমানদের হৃদয়ে নব চেতনা ও প্রাণের সঞ্চার হয়েছিলো, তেমনি বর্তমানেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যায় অবিচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সহায়ক হবে এ দৃষ্টিকোণে তাঁর জীবন ও আদর্শের চর্চা করা একান্ত জরুরী বলে মনে করি।

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

Scanned by CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَ اَوْلِيَاءَ السَّادَةِ لِلسَّمَاءِ اَقْطَابًا وَ اَعْمَادًا لِلْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ اَعْلَامًا وَ اَوْتَادًا وَ كَثَّرَهُمْ بِظَهُوْرِ الْحَقِّ بِكَوْنِهِ اَبَدًا اَعْدَادًا وَالصَّلٰوة وَ السَّلَامُ عَلٰي سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَمُسْنَدِ الْعُلَمَاءِ هِدَايَةً وَّاِرْشَادًا وَّ عَلٰي اٰلِه وَ اَصْحَابِه وَاَتْبَاعِه وَاَحْبَابِه الَّذِيْنَ جَعَلَهُمْ لِتَقْوِيَّةِ الدِّيْنِ اَقْدَامًا وَّاَحْبَارًا.

দয়াময় রব থেকে তাঁর পুণ্যবান-বান্দাদের বরকতের প্রত্যাশী আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ কারী আরজ করছি যে, কিছু (ওলী বিদ্বেষী) হিংসুক ও মুনাফিক বিশেষ করে রাফেযীরা আমাদের আকা, কুতুবে রব্বানী গাউসে সামদানী সুলতানুল আউলিয়ায়ে আরেফীন মুহিউল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আবদুল কাদের আল-হাসানী আল-হুসাইনি (কাদ্দাসাল্লাহু রুহাহু) এর মহত্ব সম্পর্কে না জেনে এ অপবাদ বলে বেড়ায় যে, তিনি সহীহ বংশধারায় 'সাইয়্যিদ' (নবীবংশ) ছিলেন না। কতেক দুর্বল লোকেরাও ওই সব বদআকীদাধারী লোকের অভিমতের সাথে একত্বতা পোষণ করে থাকে। বরং যে সব লোক তাঁর জীবন ও অবস্থা সম্পর্কে বেখবর তাদের উচিত ছিল নিজেদের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়া। আহলে ইসলাম ও গবেষকদের কাছে একথা বড় দোষের যে, কারো বংশের ব্যাপারে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করে একটা রায় দিয়ে দেয়া। তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, হযরত গাউসুল আ'জম রাআিল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশীয় কৌলিন্য ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে। আর আমি এ নাতিদীর্ঘ কিতাবের নাম 'নুযহাতিল খাতিরিল ফাতির ফী মানাকিব-ই আস্ সাইয়্যিদ শরীফ আবদিল কাদের' রাখলাম। মহান আল্লাহর কাছে সত্যকথা বলার তাওফিক কামনা করছি।

পবিত্র বংশ

হযরত মাওলানা আবদুর রহমান জামী[১২] রাহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পুস্তক 'নাফহাতুল উন্‌স মিন হাযরাতিল কুদ্‌স'-এ লিখেছেন যে, সাইয়্যিদুনা শায়খ

[১২]. হযরত মাওলানা নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামী এক সূফী, কবি এবং না'ত-ই রাসূল রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আহমদ দাশতী। 'জাম' জেলায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁর কাব্যিক নাম

আবদুল কাদের জিলানী বংশগত 'সাইয়্যিদ' (নবী বংশের লোক)। মাতা-পিতা উভয়দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত 'সাইয়্যিদ' বংশীয় শাহজাদা। সম্মানিত পিতার দিক দিয়ে হাসানী আলাভী আর মহীয়সী মাতার দিক দিয়ে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ সাওমাঈ' যাহিদ-এর মাধ্যমে হুসায়নীর (ইমাম হুসায়ন (রা:)এর) বংশধর।

ইমাম আফীফ উদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইবনে আসাদ আল-ইয়াফি শাফিঈ[১৩] স্বীয় কিতাব *'রাওযুর রায়্যাহিন ফী হিকায়াতিস সালিহীন'*-এ তাঁর বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন–

'সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের ইবনে মুসা জঙ্গি দোস্ত ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইয়্যিদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাইয়্যিদ দাউদ ইবনে সাইয়্যিদ মূসা সানী ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়্যিদ মূসা জূন ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ মাহায ইবনে সাইয়্যিদ ইমাম হাসান মুসান্না ইবনে সাইয়্যিদ ইমাম হাসান ইবনে সাইয়্যিদ আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম)।

হযরত গাউসুল আযম হচ্ছেন হযরত আবু আবদুল্লাহ সাওমাঈ' যাহিদের দৌহিদ্র। উক্ত গ্রন্থকার আরো লিখেছেন যে, তাঁর মহীয়সী মাতা উম্মুল খায়র ফাতিমা ছিলেন আবু আবদুল্লাহ সাওমাঈ' যাহিদের কন্যা। তিনি

'জামি' ধারণ করেন। তিনি মাযহাবগত হানাফী, তরীকাগত নাকশবন্দী সিলসিলার একজন বুযুর্গ। ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিন- উভয়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। তৎকালীন সুলতান হোসাইন মির্যা তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরত সা'দ উদ্দীন কাশগড়ীর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত খাজা ওবাইদুল্লাহ আহরার থেকেও তাঁর তরীকতের খিলাফত অর্জিত ছিলো এবং হযরত খাজা নকশবন্দের খলীফা হযরত খাজা মুহাম্মদ পারসা থেকেও রূহানী শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর কবিতাগুলো ইশ্‌ক ও মারিফতের তত্ত্বে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর সমকালীন প্রচলিত প্রায় সকল বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন। 'জাম' শব্দের আবজাদী সংখ্যা মান অনুপাতে তাঁর রচনাবলী রয়েছে। তিনি খাজা আলী সমরকন্দ (মীর সাইয়্যিদ শরীফের ছাত্র) এবং মাওলানা শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ (তাফতাযানীর ছাত্র)- এর দরসে শিক্ষার্জন করেছেন। তিনি তাঁর যুগে তর্ক ও মুনাযারায় অদ্বিতীয় ছিলেন। সমকালীন বিদ্যান ব্যক্তিরা তাঁর পাণ্ডিত্যকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যে-সব গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে- ১. নাফহাতুল উন্‌স, ২. শরহে মোল্লা জামী, ৩. নাকদুন নুসূস ৪. আশ'আতুল লুম'আত ৫. শাওয়াহিদুন নবুয়্যাত ৬. শরহে ফসূসুল হিকম ৭. মানাকিব-ই রুমী ৮. তোহফাতুল আহরার ৯. ইউসূফ- যুলায়খা এবং ১০. দিওয়ান। তিনি ১৮ মুহাররম ৮৯৮ হিজরীতে ওফাতবরণ করেন। কিন্দীল-ই কুদ্‌রত (قندیل قدرت) শব্দ যুগলে তাঁর ওফাতের সন নিহিত।

[১৩]. ইমাম আফীফ উদ্দীন আল- ইয়াফিঈ'-এর মাতৃভূমি ছিলো ইয়েমেন। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইয়াফি'ঈ। তিনি শাফিঈ' মাযহাবভুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কয়েক পরম্পরায় তাঁর তরীকতের সিলসিলাহ্ হযরত গাউসুল আ'যমের সাথে গিয়ে পৌছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তারিখ-ই ইয়াফি'ঈ, রাওযুর রায়্যাহীন ও নাসরুল মাহাসীন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি হযরত গাউসুল আ'যম'র জীবন-কর্মকে বড় গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি ২১ জুমাদাল আখির ৭৬০ হিজরী রবিবারে ওফাত বরণ করেন। মক্কা শরীফের জান্নাতে মু'আল্লা কবরস্থানে হযরত ফুদায়ল ইবনে আয়ায এর মাযারের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।

Scanned by CamScanner

ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবর্তী ও পবিত্রতা মহিলা। হযরত গাউসুল আযমের ফুফী আয়শা। যিনি সাইয়্যিদ আবদুল্লাহর পুণ্যবর্তী কন্যা ছিলেন। যিনি প্রকাশ্য কারামতের অধিকারীণী এবং উঁচু মর্যাদার আধ্যাত্ম সাধক ছিলেন। তাঁর দাদা 'মু'মিন' উপাধিতে এ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তাঁর পিতা হাসান মুসান্না ইবনে হাসান ছিলেন হযরত আলীর নাতি। তার মহীয়সী মাতা ফাতিমা বিনতে হুসায়নও ছিলেন হযরত আলীর নাত্নী। এভাবে হযরত গাউসুল আযম ছিলেন মাতা-পিতা উভয় বংশধারায় সাইয়্যিদ অর্থাৎ নজীবুত তারফাইন ও পূতঃপবিত্র বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মাতুলালয়

সম্মানিত মায়ের দিক দিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত ইমাম হুসায়ন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনায় তাঁর মায়ের দিকের বংশ পরম্পরা হচ্ছে–

সাইয়্যিদ মুহিয়ুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদের ইবনে আমাতুল জব্বার বিনতে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ সাওমাঈ' ইবনে সাইয়্যিদ আবু জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যিদ মাহমূদ ইবনে সাইয়্যিদ আবুল 'আতা ইবনে সাইয়্যিদ কামালুদ্দীন 'ঈসা ইবনে সাইয়্যিদ আবু আলাউদ্দীন মুহাম্মদ জাওয়াদ ইবনে ইমাম সাইয়্যিদ আলী রিযা ইবনে ইমাম মূসা কাযিম ইবনে ইমাম জা'ফর সাদিক ইবনে ইমাম বাকির ইবনে ইমাম সাইয়্যিদুশ শোহাদা আবু আবদুল্লাহ হুসায়ন ইবনে আমীরুল মু'মিনীন সাইয়্যিদ 'আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

উপরিউক্ত বংশীয় নিসবত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সাইয়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী ছিলেন– 'শরীফুত তারফায়ন' বা মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়ে সাইয়্যিদ বংশীয়। তাঁর সম্মানিত মাতা-পিতা উভয়ের বংশীয়ধারা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসায়ন রাদিআল্লাহু আনহুমার সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

তাঁর মহান বংশীয় ধারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহীহ মুতাওয়াতির বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত। এটা দিনের সূর্যের ন্যায় আলোকিত ও সমুজ্জ্বল। এ ব্যাপারে কোন প্রকারের মতানৈক্য বা ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। বিজ্ঞ জীবনীকারগণ ওটার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কিছু রাফেযী ও ধর্মত্যাগীদের সমালোচনা, কপটতা ও বিদ্বেষভাব কিছু আসে যায় না।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে বিদ্বেষকারীদের বিদ্বেষ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর পবিত্র বংশ এতো প্রসিদ্ধ যে তাতে কোন প্রকারের প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

فَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيْلٍ

আল্লামা শায়খ যাওরাক স্বীয় পুস্তক 'قواعد فى موايد قواعـد'-এ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নসবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আমাদের নিকট (ইসলামে) ধর্মীয় নিসবতই (দ্বীনি সম্পর্কই) গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ওই দ্বীনি সম্পর্কের সাথে সাথে যদি বংশীয় সম্পর্কের পবিত্রতাও অর্জন হয় তবে তা দ্বীনি সম্পর্ককে আরো জোরদার করে। আর এমন ব্যক্তির মর্যাদায় সাধারণ লোক পৌছতে পারে না। উপরিউক্তি মূলনীতির আলোকেই হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর উক্তি 'قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ' 'আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের উপর'– এর প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলো। উচ্চ বংশীয় এবং অনুপম চরিত্র-মাধূর্য্যে আর ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এক রাতে সত্তর বার স্বপ্নদোষের কারণে সত্তরবার গোসল করা এবং ওই যুগের বাদশা 'আমি এমন ইবাদত করবো, যা ওই সময় কেউ করবে না'– বলে শপথ করার উত্তরে তার এ বলে ফাত্ওয়া প্রদান করা যে, তাওয়াফের আঙ্গিনা (মাতাফ) থেকে সমস্ত মানুষকে সরিয়ে দিয়ে একাকী তাওয়াফ করার সমাধান দেওয়া তাঁর ইবাদত ও প্রখর জ্ঞান গভীরতার বড় প্রমাণ।

মাশ্রাব বা মাযহাব

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যদিও মাযহাবগত 'হাম্বলী' ছিলেন কিন্তু স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ চার মাযহাব– হানাফী, শাফিঈ' মালিকী ও হাম্বলী–এর উপর ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। ওই যুগের বাদশাকে একাকী কা'বা শরীফের তাওয়াফ করার ফাত্ওয়া একান্ত প্রয়োজনে দিয়েছিলেন। কেননা শরীয়তের প্রসিদ্ধ দলীল হচ্ছে–

لِأَنَّ الضَّرُوْرَاتِ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ.

Scanned by CamScanner

এ ফাত্ওয়া ওই ঘটনার বিরোধী নয় যে, যখন খলীফা মাহদী মক্কায় এসে কা'বা শরীফের একাকী তাওয়াফ করার জন্য তাওয়াফের আঙ্গিনা (মাতাফ) থেকে সকল লোককে বের করে দেন। তখন ওই যুগের মহান ইমাম বড় সাহসীকতার সাথে এটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দিয়ে একাকী কা'বার তাওয়াফ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন? সাধারণ লোক এবং বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আপনাকে কে অনুমতি দিয়েছেন? তখন তিনি জবাবে শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর নাম উচ্চারণ করলেন। তখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান।

সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাত্নী

'ফুতূহুল গায়ব'- এ বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী ওফাত শয্যায় শায়িত তখন তাঁর বড় ছেলে সাইয়্যিদ আবদুল ওহাব[১৪] আরজ করলেন, আব্বা! আমাকে এমন কিছু উপদেশ (ওয়াসিয়ত) করুন, যা আমি আমল করতে পারি। তিনি বললেন, 'মুত্তাকি বনে যাও। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করো না। কারো কাছে কোন প্রকারের ভরসা করো না। নিজের সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহর উপর সোপর্দ করো। তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।'

তাঁর দ্বিতীয় সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুল আযীয[১৫] তাঁর কষ্ট ও রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন করোনা। কারণ আমার আল্লাহ্ আমাকে বিভিন্ন 'হালাত' (অবস্থা) পরিভ্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁর তৃতীয় সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুল জব্বার জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বা! আপনার শরীরের কোন অঙ্গ আপনার কষ্টের কারণ? তিনি বললেন, আমার অন্তর (দিল) ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই কষ্ট দিচ্ছে। অন্তর সুস্থ ও প্রশান্তিময় আছে। তা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে বিভোর আছে।

---

১৪. শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) ছিলেন হযরত শায়খ আবদুল কাদির রাদিআল্লাহু আনহুর সবচেয়ে বড় সন্তান। ৫১২ হিজরীর শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০৩ হিজরীর ২৫ শাওয়াল মাসে ওফাত বরণ করেন। ইলমে জাহিরী ও বাতিনী নিজ পিতা থেকে অর্জন করেন। ইলমে মানকূল ও মা'কূলের সনদ তাঁর যুগের ওলামা থেকে অর্জন করেন। তিনি বেশীরভাগ সময় দ্বীনের প্রচারে অনারব বিশ্বে ভ্রমণে কাঠাতেন। পিতার অনুমতিক্রমে জনসম্মুখে ওয়ায (বক্তৃতা) প্রদান করতেন।

১৫. আবু বকর শায়খ সাইয়্যিদ শামসুদ্দীন আবদুল আযীয ইলমে জাহির ও বাতিন নিজ সম্মানিত পিতা থেকে অর্জন করেন। তিনি রূহানী শক্তির অধিকারী ছিলেন। শেষ বয়সে বুখারায় হিজরত করেন এবং শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর কুনিয়ত 'আবু মুহাম্মদ' দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর এক সাহেবজাদার নাম মুহাম্মদও ছিলো।

শায়খ আবদুল হাদী মাসূরী ইয়ামানী হযরত গাউসুল আযমের প্রশংসায় লিখেছেন-

أَبَا صَالِحٍ بِاللهِ ثُمَّ رَسُوْلِهِ ۔ أَغِثْنِي فَإِنِّي مِتُّ كَالْحُوْتِ فِي الْبَرِّ

-'হে আবু সালিহ্! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওয়াসীলায় আমাকে সাহায্য করুন, কেননা আমি শুষ্ক জমির উপর ধড়ফড়কারী মাছের ন্যায় দুঃখ-কষ্টে আছি।

উক্ত কবিতা দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু সালিহ নামেও তাঁর এক পুত্র ছিলো। তাঁর এক কন্যার নাম ছিলো আমাতুল জাব্বার ফাতিমা। হযরত আবুল হাসান আবদুর রহমান ইবনে তাফসূনজীর পুত্রের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

'কিতাবুস যাইল'-এ আছে যে, সাইয়্যিদ আবুল মাহাসিন ফাদ্লুল্লাহ্ ইবনে শায়খ আবদুর রায্যাক- যিনি প্রধান বিচারপতি আবু সালিহ নসর-এর চাচা ছিলেন, তিনি বলেন- আমি আমার চাচা সাইয়্যিদ আবু আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহ্হাব থেকে শুনেছি- (এ সনদ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আবুল মাহাসিন ফাদ্লুল্লাহ এবং আবু সালিহ নসর উভয় তাঁর নাতি ছিলেন।) তিনি বলতেন, যখন হযরত আবদুল কাদের জিলানীর ঔরসে কোন ছেলে ভূমিষ্ট হতো তখন তিনি কোলে নিয়ে বলতেন- 'এ-তো মৃত'। এভাবে নবজাতকের মহব্বত তাঁর অন্তর থেকে চলে যেতো। ফলে ওই সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তার (সন্তানের) জন্য তাঁর অন্তরে কোন প্রভাব পড়তো না। কারণ, ভূমিষ্ট হতেই অন্তর থেকে তার মহব্বত খালি করে নিতেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর অবস্থা এ ছিলো যে, ওয়াজের মজলিসে তিনি লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার মহান দায়িত্বে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। ওই সময় তাঁর কোন সন্তানের মৃত্যুর খবর দেয়া হলে তিনি তাঁর দ্বীনি কর্তব্য পালনে বিরত থাকতেন না বরং অত্যন্ত ধৈর্য্য ও প্রশান্তি মনে দ্বীন প্রচারণার কাজ চালিয়ে যেতেন। যখন মৃত সন্তানের গোসল সেরে তাঁর ওয়াজ শেষে নিয়ে আসা হতো তখন তিনি জানাযার নামায আদায় করতেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর একজন ভাইও ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো সাইয়্যিদ আবু আহমদ আবদুল্লাহ। বয়সে তাঁর ছোট ছিলেন। ইলম ও তাক্ওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি যৌবনে ওফাত বরণ করেন।

Scanned by CamScanner

'আয়শা' নামে তাঁর এক বোন ছিলো। যিনি কারামতসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। এক বছর জীলানে অনাবৃষ্টির কারণে খরা দেখা দিলে লোকদের কষ্টের সীমা থাকলো না। লোকেরা বৃষ্টির জন্য অনেক দোয়া-প্রার্থনা করল, কিন্তু বৃষ্টি হলো না। শেষ পর্যন্ত ওখানকার সমস্ত পুণ্যবান লোকেরা একত্রিত হয়ে তাঁর বোনের কাছে আসল এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন জানাল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নিজ ঘরের আঙ্গিনায় ঝাড়ু দিয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, 'হে দয়াময় রব! জমিনের উপর আমি ঝাড়ু দিয়ে দিলাম এখন উহার উপর পানি বর্ষণ করা তোমার কাজ।' এটা বলা মাত্রই বর্ষণ শুরু হলো। লোকেরা বৃষ্টি ভেজে ঘরে পৌছলো। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। জীলানেই ওফাত বরণ করেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর অন্য একজন সন্তানের নাম হচ্ছে সাইয়্যিদ ঈসা। তিনি দ্বীনি ইলম আপন বুযর্গ পিতা থেকে অর্জন করেন। পুরো জিন্দেগী শিক্ষকতা এবং মানুষকে হিদায়ত করার কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি প্রখ্যাত মুফতি ছিলেন। ইলমে তাসাওউফে 'জাওয়াহিরুল আসরার ওয়া লাতায়িফুল আন্ওয়ার' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। মিসরে গিয়ে ইলমে হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ৫৭৩ হিজরীতে মিসরেই ওফাতবরণ করেন।

সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষা

(তাঁর পুত্রদের মধ্যে) সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহ্হাব, সাইয়্যিদ আবদুল আবদুল আযীয, সাইয়্যিদ আবদুল জাব্বার, সাইয়্যিদ তাজ উদ্দীন ও সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক প্রমুখ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সুবক্তা ও মুফতি ছিলেন। সাইয়্যিদ ইব্রাহীম 'ওয়াসীত' অঞ্চলে চলে যান। সেখানেই ৫৯২ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।[১৬]

বলা হয়, সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ এবং সাইয়্যিদ মুহাম্মদও হাদিস শরীফের দরস দিতেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে এরা দু'জন ইলমে হাদিসে বড় পণ্ডিত ছিলেন। সাইয়্যিদ ইয়াহইয়া হাদীস পড়াতেন। পরিশেষে শরীয়ত ও তরীকতের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য মিসরে হিজরত করেছেন। সাধারণ লোকেরা তাঁর থেকে ইলমী ও রূহানীভাবে বেশী লাভবান হন। সাইয়্যিদ মুসা

[১৬]. শাহ্জাদা দারা শেকূ, 'সাফীনাতুল আওলিয়া' পুস্তকে তাঁর জীবনী আলোচনায় করেন। তাঁর জন্ম ৫২৮ হিজরী এবং ওফাত ৬ শাওয়াল ৬২৩ হিজরী এবং মাযার শরীফ বাগদাদে বলে উল্লেখ করেন।

দামিশ্কে হাদীস পড়াতেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। অনেক পথহারা মানুষ তাঁর সাহচর্যে এসে সুপথ লাভ করেন। কিছুকাল মিসরেও অবস্থান করেন। কিন্তু দামিশ্ককেই তিনি নিজ শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। সেখানে ৬১৮ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ওফাতবরণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বেশীরভাগ বাগদাদে ওফাতবরণ করেন। তাঁর মাযার শরীফের আশে-পাশেই তাঁদের মাযার রয়েছে। (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টি হোন)।

নাতি ও দৌহিত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা

প্রসিদ্ধ লেখক সাইয়্যিদ আফীফ উদ্দীন ইবনে মুবারক তাঁর রচিত 'আল ফাত্হুর রাব্বানী ওয়াল ফায়যুর রাহমানী' নামক গ্রন্থে হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর নাতি ও দৌহিত্রদের বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, সাইয়্যিদ আবদুস সালাম ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর ভাই সাইয়্যিদ সুলায়মান- উভয়জন ইলমে হাদীসের দরস দিতেন। সাইয়্যিদ 'ইমাদ উদ্দীন নসর, কাযীয়ুল কুযাত আবু সালিহ ইবনে সাইয়্যিদ তাজ উদ্দীন ইবনে আবদুর রায্যাক ইলমে ফিকহ্সহ তখনকার প্রচলিত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিজ পিতা ও চাচা থেকে অর্জন করেন। বাগদাদের কাযী (বিচারপতি) ছিলেন এবং বাগদাদেই ৬৩৩ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।

সাইয়্যিদ আবদুর রহীম ইবনে সাইয়্যিদ তাজ উদ্দীন আবদুর রায্যাক তরীকতের অনেক শায়খ থেকে ইলম অর্জন করেন। ৬০৬ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত বরণ করেন। তাঁকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কবর শরীফের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সাইয়্যিদ আবুল মুহাসিন ফাদলুল্লাহ ইবনে সাইয়্যিদ তাজউদ্দীন আবদুর রায্যাক, তিনি ইলমে ফিকহ আপন পিতার কাছে অর্জন করেন। ইলমে হাদীস আপন পিতা ও চাচা সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহ্হাব ও আবুল ফাত্হ প্রমুখ থেকে অর্জন করেন। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে তাতারদের হাতে শাহাদত লাভ করেন।

Scanned by CamScanner

সাইয়্যিদ ইসমাঈল ইবনে সাইয়্যিদ তাজ উদ্দীন আবদুর রায্যাক তিনি ইলমে হাদীস স্বীয় যুগের ইমামগণ থেকে অর্জন করেন। ইলমে ফিকহ্য় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাগদাদে ওফাতবরণ করেন। তাঁর দু'জন বোন ছিলো। তাঁরা উভয় স্বীয় দাদার কাছে ইলম শিক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে- সাইয়্যিদা রাহমাতুল্লাহ্ ও সাইয়্যিদা আয়শা।

সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে সাইয়্যিদ শায়খ আবদুল কাদের জিলানী তিনি অনেক শিক্ষক থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বোনের নাম সাইয়্যিদা যাহরা। তিনি বাগদাদে ওফাত বরণ করেন।

সাইয়্যিদা দাউদ ইবনে সাইয়্যিদ সুলায়মান ইবনে আবদুল ওহাব- তিনি ওই যুগের সকল প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। বাগদাদে ওফাত বরণ করেন। নিজ পিতার পার্শ্বে এবং সম্মানিত দাদার কবর শরীফের নিকটে আরাম করছেন।

সাইয়্যিদ আবু নসর ইবনে সাইয়্যিদ 'ইমাদ উদ্দীন আবু সালিহ্ নসর (প্রধান বিচারপতি) ইবনে সাইয়্যিদ তাজউদ্দীন আবদুর রায্যাক ইবনে সাইয়্যিদুনা শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের- তিনি আপন পিতা থেকে ইলম অর্জন করেন। আল্লাহর প্রকৃত রহস্যের ধারকদের তরীকায় তাঁর কথা হিকমতে পরিপূর্ণ। তরীকতের বর্ণনায় তাঁর বাণী ও কবিতাসমূহ তরীকতপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তিনি 'তামকীন'- এর ব্যাপারে নিম্মোক্ত কবিতা বলেছেনঃ

يَسْقِي وَيَشْرُبُ لاَ تَلْهِيَةَ سَكَرْتَهُ   عَنِ النَّدِيْمِ وَلاَ يَلْهُوْ عَنْ اِتَّكِاسِ
أَطَائِمَهُ سَكْرُهُ حَتَّي تَحَكَّمَ فِي   حَالِ الصَّحَاوَةِ ذَلِنْ اِهْجَبَ النَّاسِ

তিনি বলেছেনঃ

مَنْ تَوَهَّلَ بِالْوَدَادِ   فَقَلِ الْمُصْطَفَي مِنْ بَيْنَ الْعِبَادِ

তিনি ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানীর মাদ্‌রাসার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি তিন সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন- সাইয়্যিদ আবদুল কাদির, সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ ও সাইয়্যিদ যহীর উদ্দীন আহমদ। উক্ত সাইয়্যিদ যহীর উদ্দীন আহমদের এক সন্তান সইয়্যিদ সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া বাগদাদ থেকে হিজরত করে 'হুমাত' শহরে চলে যান এবং সেখানে ৬২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর

'আসী নামক নদীর পাশে অবস্থিত। তাঁর এক ছেলের নাম হচ্ছে– সাইয়্যিদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ গিলানী হামূভী। আর তাঁর দু'জন পুত্রের নাম হচ্ছে– সাইয়্যিদ আবদুল কাদের (নিঃসন্তান অবস্থান ওফাত বরণ করেন) আর সাইয়্যিদ 'আলাউদ্দীন আলী গিলানী হামূভী। তাঁর ছিলো তিন পুত্র। তাঁরা হচ্ছেন– সাইয়্যিদ বদরউদ্দীন হাসান, সাইয়্যিদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ও সাইয়্যিদ নূরুদ্দীন হুসায়ন। সাইয়্যিদ বদর উদ্দীন হাসানের দু'পুত্র হচ্ছেন সাইয়্যিদ আবদুল বাসিত ও সাইয়্যিদ আবুন নাজা। এরা দু'জন নিঃসন্তান ছিলেন। 'হুমাত' শহরে ওফাতবরণ করেন। যেখানে তাঁদেরকে দাফন করা হয়।

সাইয়্যিদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যিদ বদরুদ্দীন হাসান-এর সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক নামে এক পুত্র ছিলো। তিনি স্বীয় যুগের তরীকতের সকল শায়খের শায়খ ছিলেন। 'হুমাত' শহরে ৬৭২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

সাইয়্যিদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যিদ 'আলাউদ্দীন হামুভীর এক ছেলের নাম ছিলো মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের। তাঁর এক পুত্র শামসুদ্দীন মুহাম্মদের এক ছেলের নাম ছিলো মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের। তাঁর ছিলো তিন ছেলে– সাইয়্যিদ দরবেশ মুহাম্মদ, সাইয়্যিদ শারফুদ্দীন ও সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ। তাঁরা উভয় 'হুমাত' শহরে নিঃসন্তান অবস্থায় ওফাতবরণ করেন। আর সাইয়্যিদ আফীফ উদ্দীন হুসায়ন জিলানী হামুভী- যার সন্তানগণ 'হুমাত'-এ বসবাস করেন। তিনি ৯৯০ হিজীরতে ইন্তিকাল করেন এবং নিজ পারিবারিক বুযর্গদের কবর পার্শ্বে দাফন হন।

সাইয়্যিদ নূর উদ্দীন হুসায়ন ইবনে সাইয়্যিদ 'আলী উদ্দীন 'আলী গিলানী হামুভীর ছিল এক সন্তান। তার নাম সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া। তাঁর ছিল এক সন্তান আর তার নাম ছিলো সাইয়্যিদ শারফুদ্দীন কাসিম।আর তার ছেলের নাম ছিলো সাইয়্যিদ শিহাব উদ্দীন আহমদ। তাঁর একজন ভাইও ছিল।সাইয়্যিদ শিহাব উদ্দীনের ছেলের নাম হচ্ছে সাইয়্যিদ আলী হাশেমী। তাঁর সন্তানগণ এখনো 'হুমাত' এ বসবাস করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে শান্তি ও নিরাপদে রাখুন।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তান-সন্ততিগণ যুগের অদ্বিতীয় মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন এবং সারা পৃথিবীতে তাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। যে ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে

Scanned by CamScanner

আমরা শুধু এটা বলব যে, "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" নিশ্চয় আপনার নিন্দুকেরাই নির্বংশ ।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, হযরত ইমাম হাসান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এবং ইমাম হুসায়ন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তান-সন্ততিগণ সঠিক বংশে জন্মলাভ করেন। যাতে কোনও প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পবিত্র বংশ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কারণ বিশুদ্ধ আকীদা মতে, হযরত ইমাম মাহদী ও এ পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করবেন। আমি আমার গ্রন্থ কিতাবুল মাহদীতে তা প্রমাণ করেছি। আমি ওই পুস্তকে এটাও প্রমাণ করেছি যে, ইমাম মাহদী পিতার দিক দিয়ে হাসানী আর মাতার দিক দিয়ে হুসায়নী বংশে হবেন।

কতেক বুযর্গ বলেছেন যে, ইমাম হাসান যখন খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানদেরকে কুতুবিয়াত-ই কুবরা'র মর্যাদা দান করলেন। তিনি ছিলেন কুতুবে আকবর, হযরত আবদুল কাদের জিলানী কুতুবে আওসাত আর হযরত ইমাম মাহদী হবেন 'হাতিমাতুল আকতাব'।

শারীরিক গড়ন এবং জ্ঞান অর্জন

হযরত আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা বর্ণনা করেন, শায়খুল ইসলাম মুহীউদ্দীন আবদুল কাদীর জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির শরীর ক্ষীণ, বিস্তৃত বক্ষ, মধ্যম আকৃতি, ঘন দীর্ঘ দাড়ি ও গন্দমী রংয়ের চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন। লম্বা যুগ্ন ভ্রুযুগল, কণ্ঠস্বর উচ্চ, অত্যন্ত সুন্দর চেহারা ও তিক্ষ্ণ ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমে দ্বীন অর্জনে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং দ্বীনের শাখাগত ও মৌলিক জ্ঞান খুব ভালভাবে আত্মস্থ করেন। তিনি তাঁর যুগের অনেক যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও শায়খগণ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। ইলমে ফিকহ আবুল ওয়াফা[১৭] আলী ইবনে 'আকীলের মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ থেকে

[১৭]. তাজুল আরিফীন হযরত শায়খ আবুল ওয়াফা আলী ইবনে আকীল রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত গাউসুল আযমের শিক্ষকগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। হযরত শায়খ গুনায়কীর সাথে তাঁর তরীকতের বায়আতের সম্পর্ক ছিলো। শায়খ আলী হায়তী, শায়খ বাকা ইবনে বতূ , শায়খ আবদুর রহমান তাফসূনজী, শায়খ মিত্তরাবা আল-বারযানী, শায়খ মাজিদ কারদী, শায়খ আহমদ ইবনে তাকী প্রমুখ তাঁর মুরীদ ছিলেন। হযরত গাউসুল আযম প্রথমে বাগদাদে এসে তাঁর দরসে (শিক্ষা মজলিসে) অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত গাউসুল আযমকে বিশেষ দয়ার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে নিয়ে বড় অহংকার করতেন। ৫০০ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত বরণ করেন। বাগদাদের 'কালমিনা' এলাকায় তাঁর মাযার বিদ্যমান।

অর্জন করেন। ইলমে হাদীস যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ থেকে অর্জন করেন। বিস্তারিত জানার জন্য আমার পুস্তক 'আরবাঈন' দেখুন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আলী তাবরিযী থেকে আরবী সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন। আপন যুগের শ্রেষ্ঠ শায়খ ও ওলীগণের সাহচর্যে থেকে রূহানী আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা হবে।

জ্ঞান অর্জনে তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেন। শেষ বয়সে পার্থিব সকল সম্পর্ক থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর স্মরণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহর বান্দাদেরকে ওয়াজ-নসীহত এবং শিক্ষার্থীদেরকে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানে সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ওই যুগে তিনি ইমামুল ফরীকায়ন, মাওযিহুত তরীকায়ন, করীমুজ জাদ্দাইন মু'আল্লিমুত তারফাইন ও গাউসুস সাকালাইন ইত্যাদি উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যুগের সকল প্রশংসা তাঁর জন্য বলতে শুনা যায়। ইলমের মর্যাদা তাঁকে সৌন্দর্যময় করে তুলে। তাঁর কারণে শরীয়ত শক্তি লাভ করে। আলিমগণের বিরাট একটি দল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যুগের ফকীহগণ তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্য ভিড় করতে থাকেন। অনেক তরীকতের শায়খ ও তরীকতের পথিক তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যশালী করে তুলেন। তিনি ইয়েমেনের শায়খ-ই তরীকতগণের রূহানী প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হন। অনেকে বাগদাদে এসে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। আবার অনেকে দূত পাঠিয়ে খিলাফতের খিলআত অর্জন করেন।

এ কারণে হযরত আবু মাদয়ান[১৮] শু'আয়ব মাগরিবী পশ্চিমাদের উপর পূর্বাঞ্চলীয়দেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কেননা, হযরত আবদুল কাদের জিলানী পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতেন এবং তিনি পবিত্র মক্কা-মাদীনার শায়েখগণকে শিক্ষা দিয়েছেন।

[১৮]. তাঁর প্রকৃত নাম শায়খ শুআইব ইবনে হুসায়ন আবু মাদইয়ান। তিনি শায়খ আবুল গায়রা মাগরিবী (রহঃ) এর মুরীদ ছিলেন। হযরত সাইয়্যিদ আবদুল কাদের (রহঃ)-এর তরীকতের শায়খ ছিলেন। তিনি 'মাগরিব' এলাকার উচ্চ মর্যাদাবান শায়খগণের অন্যতম। তিনি কাশ্ফের মাধ্যমে হযরত গাউসুল আযমকে যখন 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর' উক্তি করতে শুনলেন তখন মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ مَلٰٓئِكَتَكَ اَنِّیْ سَمِعْتُ وَاَطَعْتُ' তিনি ৫৯০ হিজরী সালে ওফাত বরণ করেন। (সাফীনাতুল আওলিয়া কৃত দারা শেকূ)

Scanned by CamScanner

রচনাবলী

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অনেক রচনাবলী রেখে যান। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্মোক্ত পুস্তকগুলো সত্য তালাশকারীদেরকে সর্বদা সত্যের দিশা দিয়ে আসছে।

১. গুনিয়াতুত তালিবীন।
২. ফুতূহুল গায়ব- এ দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে ইলমে তাসাউফের সারাংশ এবং দোষ-ত্রুটি মুক্ত গ্রন্থ। তাঁর প্রসিদ্ধ অন্য একটি পুস্তক হচ্ছে–
৩. জালাউল খাতির ফীল বাতিনি ওয়ায্ যাহির। তাঁর বক্তৃতা সংকলন হচ্ছে-
৪. ফাতহুল রাব্বানী ওয়াল ফায়যুর রহমানী।
৫. 'মাকাতিব'- এটা ফারসী ভাষায় তাঁর পত্র সংকলন।
৬. দিওয়ান– তাঁর কবিতা সংকলন, যাতে তরীকতের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।
৭. 'ইমদাদে ইয়াওমিয়া'– তরীকতপন্থীদের জন্য সঞ্জীবণীর মতো।
৮. ইদ্‌রাবে মুসতাফীযাহ্ ও
৯. সালাতুশ শরীফ – এ দু'টি হচ্ছে আল্লাহ প্রাপ্তির খোলা দরজা স্বরূপ।

গীলান জন্মস্থান

'গীলান' হচ্ছে হযরত আবদুল কাদিরের জন্মস্থান। আরবীতে 'গাফ' (گ) কে 'জীম' (ج) দ্বারা পরিবর্তন করে 'জীলান' উচ্চারণ করা হয়। এটার সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে 'জীলী'। তিনি ৪৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে ওফাত বরণ করেন।

তিনি যখন তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন তখন চাঁদ 'সা'দ' মানযিলে ছিলো। যার অর্থ হচ্ছে, তিনি সম্মানিত নবীগণের মতো নিষ্কলুষ পবিত্র জীবন নিয়ে এসেছেন। তাঁর মহীয়সী মাতা আমাতুল জাব্বার[১৯] বলেন, 'যখন আমার ছেলে আবদুল কাদের ভূমিষ্ট হয় তখন সে রমযান মাসে দিনের বেলায় দুধ পান করতো না। আকাশ মেঘাচ্ছন্নের কারণে ঈদের চাঁদ দেখা না গেলে তাঁর

১৯. উম্মুল খায়র আমাতুল জাব্বার বিনতে শায়খ আবদুল্লাহ সাওমা'ঈ হচ্ছেন হযরত গাউসুল আযম'র মাতা, তিনি আল্লাহ ওয়ালা মহিলা ছিলেন। তাঁর ৬০ বছর বয়সে হযরত গাউসুল আযম জন্মগ্রহণ করেন। যে সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের মধ্যে হযরত গাউসুল আযম লালিত-পালিত হন তাতে তাঁর মহীয়সী মায়ের ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। হযরত গাউসুল আযমের বাল্য বয়সে তাঁর মায়ের উপদেশই ডাকাতদলকে তাওবা করানোর সাহস যুগিয়েছিলো। তিনি হযরত গাউসুল আযমের শিক্ষার্জন কালীন সময়ে ওফাত বরণ করেন। খুব সম্ভব তিনি ৪৮৮ হিজরীর পর ইন্তিকাল করেন। [সফীনাতুন আওলিয়া]

মা পুরো নিশ্চয়তার সাথে বলতেন যে, আজ রমযানের শেষ তারিখ। কারণ আবদুল কাদের আজ দুধ পান করে নি। ওই দিন থেকে সারা গীলান শহরে একথা প্রসিদ্ধি লাভ করলো যে, আশরাফের ঘরে যে সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, সে রমযানে দিনের বেলায় দুধ পান করেন না।

সাইয়্যিদুনা কুত্‌বুল আকতাব শায়খ সাইয়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী বলেন, ছেলে বেলায় একবার আমার মাঠে যাওয়ার সুযোগ হয়। সাধারণত কৃষকের মতো একটি গরুর পেছনে দাঁড়িয়ে হাল চালাতে থাকি। তখন আমার আশ্চর্যের সীমা রইলো না যখন আমি দেখলাম ওই গরু একজন মানুষের মত আওয়াজ করে আমাকে বলতে লাগলো, হে আবদুল কাদের! তোমাকে কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি আর আল্লাহ তোমাকে এটার নির্দেশও দেন নি। একথা শুনে আমি ভয় পেলাম। ঘরে চলে আসি। ঘরের ছাদে উঠে হাজী সাহেবদেরকে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার মায়ের কাছে এসে শরীয়ত ও তরীকতের উচ্চ ইলম অর্জন করার জন্য বাগদাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমার দৃঢ় সংকল্প দেখে তিনি কাঁদলেন এবং ঘরের ভেতরে গিয়ে আমার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাওয়া ৮০ দিনার বের করলেন। ৪০ দিনার আমার ভাইয়ের জন্য রেখে বাকী ৪০ দিনার আমাকে দিলেন এবং আমার জামার আস্তিনের নিচে তা একটি পকেটে সেলাই করে দিলেন। আর সফরের অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এ বলে উপদেশ দিলেন, বৎস! সর্বদা সত্য কথা বলবে। বিদায়ের প্রাক্কালে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি। হয়তো তোমাকে আর এ ইহজীবনে দেখবো না।

আমি বণিক কাফেলার সাথে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হই। আমাদের কাফেলা যখন হামদান অতিক্রম করলো তখন ৬০ জনের একটি ডাকাতদল কাফেলার উপর আক্রমণ করে বসলো। সকলের সহায়-সম্পদ সব লুট করে নিলো। কিন্তু কেউ আমার প্রতি তাকালো না। সবশেষে একজন ডাকাত আমার কাছে এসে বললো, ফকীর! তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যা! ৪০টি দিনার আমার বগলের নিচে জামার আস্তিনে সেলাই করা আছে। আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি ভেবে ডাকাতটি চলে গেলো। অন্য একজন ডাকাত পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে আমি পূর্বের ন্যায় উত্তর দিই। সমস্ত ডাকাত যখন তাদের সরদারের কাছে একত্রিত হলো আমার ব্যাপারে তাকে অবহিত করা হলো, তখন ডাকাত সরদার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি

Scanned by CamScanner

গিয়ে দেখলাম তারা লুটেরা সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত। সরদার আমাকে বললো, তোমার কাছে কী আছে? আমি তাকে ওই ৪০ দিনারের কথা বললাম। তখন সে বললো, দেখো তো ছেলেটি সত্য বলছে কি না। যখন আমার কথা সত্য প্রমাণিত হলো, তখন সে বললো, তোমাকে সত্যকথা বলতে কিসে উৎসাহিত করলো। তোমার কাছে কিছু নেই বললেই তো আমরা বিশ্বাস করতাম। আমি বললাম, ঘর থেকে আসার সময় আমার মা আমাকে সর্বদা সত্যকথা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে ডাকাত সরদার অজোরে কাঁদলেন আর বললেন, এ ছোট্ট ছেলে মায়ের উপদেশ মান্য করা থেকে সরে দাঁড়ায়নি কিন্তু আমি আল্লাহর অবাধ্যতায় সারা জীবন নষ্ট করলাম। তখন ডাকাত সরদার ও তার দল সবাই তাওবা করলেন। কাফেলার মাল ফিরিয়ে দিলেন। এক বর্ণনায় এও আছে যে, ডাকাতদলসহ ওই কাফেলার সকলেই তাঁর হাতে তাওবা করলেন এবং সম্পদ সকলের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়। ওই সফরে ৪৮৮ হিজরীতে তিনি বাগদাদে পৌছলেন এবং ওই যুগের বড় বড় আলিমগণ থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আদব ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি তাঁর সহপাঠিদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। ৫২১ হিজরীতে তিনি ওয়ায ও শিক্ষাদান কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবন সংশোধনে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর কারামতসমূহ তাওয়াতুরের সীমা অতিক্রম করে যায়। তাঁর সকল জীবনীকার এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে পরিমাণ কারামত ও বরকত তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে, বেলায়তের অধিকারী কোন ওলী থেকে প্রকাশ পায় নি।

খিলাফত অর্জন

তিনি হযরত শায়খ আবু সা'ঈদ মুবারক ইবনে আলী মাখযুমী[২০] থেকে তরীকতের খিলাফত অর্জন করেন। তিনি শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ কারশী হাক্কারী থেকে, তিনি শায়খ আবুল ফারাহ তারতূসী থেকে,

[২০]. আবু সা'ঈদ মুবারক ইবনে আলী মাখরামী (মাখযূমী) ছিলেন, কামিল বুযুর্গ ব্যক্তি। হযরত খাযিরের সাথে ছিলো তাঁর বন্ধুত্ব। হাম্বলী মাযহাবযুক্ত এবং শায়খ আবুল হাসান আল-হাক্কারীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ ও খিলাফত অর্জন করেন। হযরত গাউসুল আযম তাঁর থেকে খিলাফতের খিরকা অর্জন করেন। যখন হযরত গাউসুল আযম আল্লাহর সাথে এমর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে স্বয়ং খাওয়ানো ও পান করানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু খাব না ও পান করব না।' তখন তিনিই তাঁকে পানাহার করালেন। ৫১৩ হিজরীতে তিনি ওফাত বরণ করেন।

খিলাফত অর্জন করেন। শায়খ তারতূসী হযরত আবু বকর শিবলী থেকে, আর তিনি শায়খ আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী থেকে, তিনি শায়খ সিররী সাক্বতী থেকে, তিনি শায়খ মারূফ কারখী থেকে, তিনি শায়খ দাউদ তা'য়ী থেকে, তিনি শায়খ হাবীব আজমী থেকে, তিনি শায়খ হাসান বসরী থেকে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে খিলাফতের খিরকা অর্জন করেন। আর হযরত আলী রাসূলকুল সরদার হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খিলাফতের খিরকা লাভ করেন।

হযরত গাউসুল আযমের শায়খগণের মধ্যে হযরত হাম্মাদ দাব্বাসও রয়েছেন। তিনি ছিলেন 'উম্মী'। কিন্তু শরীয়ত ও তরীকতের জ্ঞান ও নিগুঢ় রহস্যের দ্বার তাঁর জন্য খুলে গিয়েছিলো। বড় বড় তরীকতের শায়খগণ তাঁর থেকে ফয়েয অর্জন করেন।

একদিন হযরত আবদুল কাদের জিলানী হযরত হাম্মাদ[২১] দাব্বাসের সাথে এক মুসাফিরখানায় বসা ছিলেন, যখন কোন প্রয়োজনে হযরত গাউসুল আযম বাইরে গেলেন তখন হযরত হাম্মাদ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, এ যুবকের কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের উপর হবে। আর আল্লাহর নির্দেশক্রমে একদিন তিনি প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করবেন যে, " قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ " 'আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর।' ওই যুগের আল্লাহর সমস্ত ওলী তাঁর সম্মানে তাঁর কদমের নীচে গর্দান ঝুকিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে নেবেন। তাঁর মাধ্যমেই তাঁদের বেলায়তের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

একদিন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরের উপর বসে ওয়াজ করছিলেন। সাধারণ লোকজন ছাড়াও ওই মজলিসে ৫০ জন আল্লাহর ওলীও উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে যখন তাঁর পবিত্র জবান থেকে এ উক্তি প্রকাশ পেলো, 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর', তখন তরীকতের ইমামগণের সরদার শায়খ আলী ইবনে আল-

[২১]. তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ, প্রকৃত নাম হাম্মাদ ইবনে মুসলিম আর 'দাব্বাস' হচ্ছে তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন হযরত গাউসুল আযমের বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁর যুগের কারামত সম্পন্ন বুযর্গ ছিলেন। যদিও তিনি 'উম্মি' ছিলেন কিন্তু ইলম ও মারিফতের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর ১২ হাজার মুরীদ ছিলো। তিনি তাঁর প্রত্যেক মুরীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

Scanned by CamScanner

হায়তী[২২] দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মিম্বরের পাশে গিয়ে তাঁর বরকতময় কদম নিজ কাঁধের উপর রাখলেন, যাতে তাঁর ঘোষণার উপর কার্যত আমল হয়। শুধু তা নয় ওই মজলিসে উপস্থিত সকল ওলী ও তরীকতের শায়খগণ স্ব স্ব গর্দান হযরত গাউসুল আযমের পায়ের নিচে রাখলেন। আর দূরবর্তী এলাকার শায়খগণ তাঁর এ ঘোষণা কাশফের মাধ্যমে জেনে নিজেদের গর্দান ঝুঁকালেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত শায়খ আবু মাদইয়ান মাগরিবী ওই সময় ছাত্রদেরকে দরস দিচ্ছিলেন, তখন স্বীয় গর্দান ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'আপনার কদম আমার মাথা ও দু'চোখের উপর।' উপস্থিত ছাত্ররা এ কথার মর্মার্থ জানতে চাইলে তিনি গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের এর বেলায়তের ঐ ঘোষণার কথা বললেন।

অনারব দেশীয় এক ওলী তাঁর এ ঘোষণাকে অস্বীকার করলে তার বিলায়েত লোপ পেয়ে যায়। এ ঘটনা একথার দলীল যে, তিনি কুতুবুল আকতাব ও গাউসুল আযম ছিলেন।

হযরত শায়খ আলী ইবনে হায়তীর বর্ণনায় বিশুদ্ধ সনদে তাঁর এ কারামত প্রসিদ্ধ যে, যদি কোন ব্যক্তি বাঘের মুখামুখি হয় তখন যদি হযরত গাউসুল আযমের নাম স্মরণ করা হয়, বাঘ তার উপর হামলা করবে না। মাছির অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য যে ব্যক্তি তাঁর নামের ওযিফা পড়বে মাছি ওই স্থান থেকে চলে যাবে।

হযরত গাউসুল আযমের ছেলে শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওহাব বর্ণনা করেন, প্রতি চন্দ্র মাসের নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার পূর্বে ওই মাস মানবাকৃতিতে আমার সম্মানিত পিতার কাছে উপস্থিত হতো। যদি আগত মাসের অবস্থাদি উত্তম বলে মনে হতো তখন সে সুশ্রী আকৃতি নিয়ে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতো। অধিকন্তু ৫৬০ হিজরীর জুমাদাল আখিরের শেষ শুক্রবার অনেক শায়খ-ই তরীকতের উপস্থিত এক সুন্দর গড়নের যুবব এসে আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া ওলীআল্লাহ বললো। আর বললো, আমি রজব মাস, আপনাকে এ সুসংবাদ দিতে এসেছি যে, এ মাস আপনার জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ হবে। তেমনিভাবে রজব মাসের শেষ দিন

[২২]. তিনি তাজুল আরিফীন শায়খ আবুল ওয়াফার মুরীদ ছিলেন। হযরত গাউসুল আযমের সাথে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব, তাঁর প্রশংসাকারী এবং তরীকত পথের বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের তরীকতের শায়খগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হতেন। ৫৬০ হিজরীর ১২০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। 'ওয়াযীরান' শহরে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

এক কুশ্রী ব্যক্তি এসে আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া ওলীউল্লাহ বলে সালাম দিয়ে বললো, হুযূর! আমি হলাম শাবান, এ মাসে বাগদাদে অনেক লোক মৃত্যুর শিকার হবে। হিজায অঞ্চলে দূর্ভিক্ষ দেখা দেবে। খারাসানে যুদ্ধ ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং ওই মাসে তাই হলো।

এক বছর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওই সময় তাঁর কাছে এক অপরিচিত লোক আসলো। তখন তার মজলিসে আমি এবং বড় বড় শায়খ-ই তরীকত ছাড়াও হযরত শায়খ আলী হায়তী, শায়খ নজীব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই আগন্তুক এসে বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া ওলীউল্লাহ। আমি রমযান মাস। আপনার রোগ আরোগ্যের দিকে ধাবিত হয়ে গেছে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী আর বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনার সাথে এটা আমার শেষ সাক্ষাৎ। এ কথা বলে ওই ব্যক্তি চলে গেলে। ওই বছর রবিউল আখির মাসে তিনি ওফাত বরণ করেন। তাঁর ওফাত রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে রবিউল আখির মাসে হওয়ার রহস্য হচ্ছে, ওলী, নবী থেকে মর্যাদায় দ্বিতীয় স্তরের। স্মতব্য যে, রবিউল আখিরের ১১ তারিখে তাঁর ওফাত বরণ করা প্রমাণিত নয়। তারপরও ওই দিবসে তাঁর ওফাত দিবস পালন করার কোন বিশেষ কারণ অবশ্যই থাকতে পারে।

অমীয় বাণী

১. প্রত্যেক মু'মিন–মুসলমানকে প্রতিটি অবস্থায় তিনটি বিষয়ে আমল করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এক. আল্লাহর আদেশ পালন করা, দুই. তাঁর নিষেধ করা বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তিন. তাকদীর বা অদৃষ্টের ভাল-মন্দকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্টতার সম্পর্ক গড়ে তুলে, সে আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির অন্য সব থেকে নিশ্চিন্তা ও নিরাপদ থাকে। মনের কুপ্রবৃত্তি মানুষকে সরল পথ এবং আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে বিরত রাখে। কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

৩. প্রত্যেক মু'মিনের উচিত, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহুর হাদীসকে নিজের জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা, যাতে উভয় জগতের কল্যাণ লাভ হয়। এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, একদিন আমি (ইবনে আব্বাস) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই

Scanned by CamScanner

বাহনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ কর, আল্লাহ তোমার হকসমূহ রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে ধ্যান কর, ফলে তাঁর সাহায্য তোমার অর্জিত হবে। কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। যা কিছু হবার আছে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যদি দুনিয়ার সকলে মিলে কোন ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই, যা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেননি, তবে তারা তেমনি কখনো করতে পারবে না। যদি কোন কিছু হয়, তবে তা আল্লাহর হুকুমে হয়েছে বলে নিশ্চিত বিশ্বাস কর। যদি কোন কিছু তোমার আশার অনুরূপ না হয়, তবে নিরাশ হয়ো না। কারণ ধৈর্যের মাধ্যমে ওই বস্তু থেকেও অনেক কল্যাণ বের হয়ে আসতে পারে, যে সব বিষয়কে তুমি প্রকাশ্য মন্দ বলে মনে করছো। আর স্মরণ রাখ, বিজয় ও কল্যাণ ধৈর্য্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অভাবের পর রয়েছে প্রাচুর্য। সুখের সাথে কষ্টও রয়েছে।

৪. লোকদের কাছে ওই ব্যক্তিই প্রার্থনা করে, যে আল্লাহ সম্পর্কে জানে না, যার ঈমান দূর্বল এবং আল্লাহর মারিফত ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস যার কমে গেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও পরিচিতি রয়েছে। আর তার ঈমান ও বিশ্বাস অত্যন্ত মজবুত। তার আল্লাহর পরিচিতি জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি লজ্জা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন আন্ত রিক বিশ্বাস পোষণ কর, যেনো তিনি ব্যতীত কিছু নেই। আর সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ কর, যেনো তোমার প্রবৃত্তি বলতে নেই। যদি আল্লাহর সাথে এমন আচরণ কর, তবে তুমি তাঁকে পাবে এবং সমস্ত সৃষ্টি তোমার থেকে বিলীন হয়ে যাবে। যখন আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তোমার আচরণ প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতিরেখে হবে, তবে তোমার দ্বারা ন্যায় বিচার হবে এবং তুমি মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে। যখন অন্তর আল্লাহর স্মরণে সর্বদা মশগুল থাকে, তখন কোন কিছুই অন্তর থেকে পৃথক হয় না এবং সব কিছুর জ্ঞান তার মধ্যে এসে যায়। যেনো আমি হাড় ছাড়া মগজ।

৫. হযরত গাউসুল আযমের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে সব মহান নিয়া'মত দান করেছেন, উহার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার এবং তোমাদের ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য বিদ্যমান। আমাকে কারো উপর অনুমান করো না আর না কোন কিছুকে আমার উপর

অনুমান করো, যেমনিভাবে বাদশাহগণকে অন্যদের উপর অনুমান করা হয় না। (ফুতূহুল গায়ব)

৬. আমি দু' কদমে (নাফস ও চরিত্র) আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে গেছি।

৭. 'গুনিয়াতুত তালিবীন' গ্রন্থে আবু আওয়াইল থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি চাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের ১৯জন দারোয়ান থেকে রক্ষা করুক, তার উচিত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া। এতে ১৯টি অক্ষর রয়েছে। আর প্রতিটি অক্ষর ঢাল হয়ে তাকে রক্ষা করবে।

৮. আল্লাহ যার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান, তাকে তাঁর সান্নিধ্য দান করেন। তখন তার থেকে ছোট গুণাহও সংঘটিত হয় না। বরং আল্লাহর আদেশের প্রতিটি বিরোধিতা তার কাছে বড় গুনাহ বলে মনে হয়। কেউ কেউ বলেছেন, যখন বান্দা গুণাহকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে, তখন আল্লাহ ওই গুণাহকে বড় বলে জানেন। আর বান্দা যখন কোন গুণাহকে বড় বলে মনে করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওই গুণাহকে ছোট বলে জানেন।

৯. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মু'মিন আপন গুণাহকে পাহাড়ের মতো বড় বলে দেখেন আর মুনাফিক নিজ গুনাহকে মাছির মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেন তা তার নাকে বসেছে আর উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

কেউ বলেছেন, যে গুণাহ ক্ষমা করা হবে না, তা'হচ্ছে মানুষ একথা বলা যে, 'হায় যদি আমি তেমনি কাজ করতাম।' এটা তার ঈমানের দূর্বলতার পরিচায়ক এবং আল্লাহ সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণ। কারণ, যদি সে ওই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতো তবে অতি তুচ্ছ গুণাহকেও বড় বলে মনে করতো।

আল্লাহ কতেক নবীর প্রতি ওহী করেছেন যে, হাদিয়ার সল্পতার প্রতি লক্ষ্য করো না বরং অভিযোগকারীর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখো। আর যে কোন গুণাহকে তুচ্ছ বলে মনে করো না, বরং ওই মহান সত্তার বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখ, যার সামনে এ গুণাহ করা হচ্ছে।

কোন সাহাবী স্বীয় অনুসারী কোন তাবিঈ'কে বললেন, অনেক সময় তোমরা এমন এমন কাজ করে বসো যা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। অথচ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ওই কাজকে নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে গণ্য করতাম।

Scanned by CamScanner

তাওবা ও তাক্ওয়া সম্পর্কে কতেক আরিফদের বাণী

১. হযরত যুননুন মিসরী[২৩] বলতেন, সাধারণ লোক গুণাহ থেকে তাওবা করে থাকে, আর বিশেষ লোকেরা গাফলাত বা আল্লাহর থেকে অমনোযোগিতার গুণাহ থেকে তাওবা করেন। আর গাফলাত থেকে তাওবাকারী, সুন্দর জিনিস দেখা থেকে তাওবাকারী এবং আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে তাওবাকারী- এ তিন ব্যক্তি একজন অপরজন থেকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা- " بَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ" আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, গুণাহকে অগ্রে আর তাওবাহকে তার পরে স্থান দিও। মানুষ সব সময় বলে যে, আমি অতিসত্তর তাওবাহ করে নিবো, অথচ তাওবাহ ছাড়াই ওই মন্দা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

৩. হযরত আবু 'আলী দিকাক বলেন, 'তাওবাহ্' মানে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া। তাওবাহ তিন প্রকার। তাওবাহ্, এনাবাত ও আওয়াবাত। যে ব্যক্তি শাস্তির ভয়ে তাওবাহ করে সে হচ্ছে 'সাহিব-ই তাওবাহ'। আর যে সাওয়াব (পুণ্য) লাভের আশায় তাওবা করে সে হচ্ছে এনাবাতকারী। আর যে 'গাফলাত' (আল্লাহর থেকে অমনোযোগিতা) থেকে তাওবাহ করে সে হচ্ছে 'আওয়াব'।

৪. কতেক বুযুর্গ বলেছেন, তাওবাহ হচ্ছে মুমিন বান্দার গুণ বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'ইনাবাত' হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যধন্য ওলীগণের গুণ বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[২৩]. আবু আবদুল্লাহ হযরত শায়খ যুননুন মিসরী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বসরার অধিবাসী ছিলেন। আল্লাহর অনেক ওলী তাঁর থেকে আধ্যাত্মিক করুণা (ফয়েয) লাভে ধন্য হন। তিনি ৪০ বছর যাবৎ আধ্যাত্ম সাধনা করেন। হযরত ইমাম মালিক রাহমতুল্লাহি আলাইহির শিষ্য এবং হযরত ইসরাফীল রাহমতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ছিলেন। তাঁকে 'সিলসিলা-ই মালামাতিয়াহ্' –এর ইমাম বলা হয়। হাজার সংখ্যক কারামত তাঁর থেকে প্রকাশ পায়। তিনি ২৬ শা'বান ২০৫ হিজরীতে মিসরে ওফাত বরণ করেন। তাঁর মাজার শরীফের শিলালিপিতে লিখা আছে– ذُوالنُّوْنُ حَبِيْبُ اللهِ مِنْ الشَّوْقِ قَتِيْلُ اللهِ অর্থাৎ 'যুননুন আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর প্রেমে শহীদ হন।

﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾

আর 'আওয়াব' হচ্ছে, নবী ও রসূলগণের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

৫. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, একদিন আমি হযরত সর্‌রী সাকতী রাহমতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে উপস্থিত হই। তখন তাঁকে চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, আজকে এক যুবক আমার কাছে জানতে চাইলো যে, 'তাওবাহ' কাকে বলে। আমি তাকে বললাম, তাওবা হচ্ছে নিজের কৃত গুণাহর কথা ভুলে না যাওয়া। তখন ওই যুবক আমার কথায় মতানৈক্য করে বললো, তাওবাহ হচ্ছে- তাওবাই। অর্থাৎ নিজের গুণাহকে ভুলে যাওয়াই হচ্ছে তাওবা। হযরত জুনাইদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ওই যুবকের কথা আমার কাছেও সত্য বলে মনে হচ্ছে। হযরত সর্‌রী সাকতী তার কারণ জানতে চাইলে আমি বললাম, আমি হালে জাফা'র মধ্যে ছিলাম কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে হালে ওয়াফার দিকে নিয়ে গেলেন। সুতরাং হালে ওয়াফা অবস্থান করে জাফার স্মরণ করাও জাফা। আমার এ কথা শুনে হযরত সর্‌রী সাকতী চুপ হয়ে গেলেন।

৬. হযরত উমর ইবনে 'আবদুল আযীয বলেন, দিনে রোযা রাখা আর রাতে নামায পড়া এবং বাকী সময় অবহেলায় নষ্ট করার নাম 'তাকওয়া' নয়। বরং 'তাক্ওয়া' হচ্ছে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করা, আর যা ফরয করেছেন তা পালন করা। এ ছাড়া যা কিছু পুণ্য করবে তা কল্যাণের দিকে ধাবিত করবে।

৭. ইবনে হাফীফের মতে 'তাক্ওয়া' হচ্ছে ওই সব কাজ থেকে বিরত থাকা, যা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৮. হযরত আবুল হাসান নূরী বলেন, মুত্তাকি ওই ব্যক্তিই যে দুনিয়া এবং দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকে।

৯. হযরত আবু যায়িদ বলেন, ওই ব্যক্তিকে মুত্তাকি বলা হয়, যে যখন কথা বলে আল্লাহর জন্য বলে। আর যখন চুপ থাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চুপ থাকে।

১০. হযরত আবু দারদা রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

Scanned by CamScanner

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا مَا أَرَادَ
يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي وَتَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَ

'মানুষ তার মনোবাসনা পূরণ হোক তাই কামনা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করে থাকেন। মানুষ বলে এটা আমার জন্য উপকারী। অথচ তাক্ওয়া সমস্ত উপকার থেকে উত্তম।'

১১. হযরত কাত্তানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিপদাপদের উপর দুনিয়া বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু জান্নাত বন্টন করা হয়েছে তাক্ওয়ার উপর। "اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه" আয়াতের তাফসীর হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর অবাধ্যতা করো না। তাকে স্মরণ করো, তাঁকে ভুলে যেয়ো না। তাঁর নিয়া'মতের শুকরিয়া আদায় করো, নিয়ামতের না-শুকরী করো না।

রোযার আদব ও গাউসুল আযমের উক্তি

১. রোযাদারের উচিত, নিজ রোযাকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা। হযরত শায়খ আবদুল্লাহ, শায়খ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ শাফিঈ' থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে 'ঈসা সুকনী থেকে, তিনি ইবনে ইসহাক আল হিতাম থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে যরীন বরামায়নী থেকে, তিনি শায়খ ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি মাশ'আর ইবনে কিরাম ইবনে 'আতীয়াহ থেকে, তিনি হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে, তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন যে, রজব মাস হচ্ছে হারাম মাস।

এ মাসে আসমানের দরজাসমূহে লিখা থাকে যে, যখন কোন ব্যক্তি শা'বান মাসে একদিন রোযা রাখবে এবং আল্লাহর ভয়ে রোযাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করবে, ওই দরজাসমূহ বলে, হে রব! তাকে ক্ষমা করুন। যদি ওই ব্যক্তি রোযাকে তাক্ওয়া থেকে পৃথক রাখে তখন বলে, তোমার নাফস তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।

২. শায়খ আবু নসর মুহাম্মদ ইবনে বানা আমাকে বলেছেন, তিনি এ হাদীস মুহাম্মদ হাফিয, আবদুল্লাহ, জা'ফর ইবনে আহমদ হাম্মাল, সাঈদ 'আনবাহ, তাকনীয়াহ, হাজ্জাজ, খাকান ও আনাস ইবনে মালিক প্রমুখ শায়খ পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন, পাঁচটি

বস্তু রোযা ও ওযুকে নষ্ট করে দেয়। তা হচ্ছে- মিথ্যা, চোগলখোরী, গীবত, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কারো প্রতি তাকানো এবং মিথ্যা শপথ।

৩. হযরত আবু নসর আপন সম্মানিত পিতা থেকে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি লোকদের মাংস খায় (গীবত করে) তার রোযা হয় না।

৪. হযরত আবু নসর তাঁর সম্মানিত পিতা থেকে হযরত খুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কোন পর মহিলার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে (কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে) থাকায় তার রোযা বাতিল হয়ে যায়।

৫. হযরত আবু নসর, হযরত সুলায়মান ইবনে মূসার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন রোযা রাখবে, তোমাদের কান, চোখ ও জিহ্বাও যেনো মিথ্যা ও হারাম থেকে বিরত থাকে।

৬. হযরত আবু নসর নিজ সম্মানিত পিতার সনদ সূত্রে আবু ফিরাশের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ছাড়া প্রত্যেকদিন রোযা রাখতেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় রোযা রেখেছেন। আর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, যেনো তাঁরা সারা জীবন রোযা রেখেছেন।

৭. শায়খ মনসূর নিজ পিতা থেকে মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদভীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে রোযার প্রকৃতি বলুন! হুযূর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হুযুরের চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। যখন হযরত 'উমর রাদিআল্লাহু আনহু খবর জানতে পারলেন তিনি ওই বেদুঈনকে ভর্ৎসনা করলেন। যখন ওই বেদুঈন চুপ হয়ে যায়, তখন তিনি (হযরত ওমর) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আমাকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন যে বিরতিহীনভাবে (নফল) রোযা রাখে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এভাবে রোযা রাখা এবং রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নেই। হযরত ওমর আবার আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন যে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বৃহস্পতিবার এমন দিন, যে দিনে বান্দার আমলসমূহ আসমানে তুলে নেয়া হয় আর সোমবার এমন দিন, যেদিনে আমি (পৃথিবীতে) জন্মগ্রহণ করেছি এবং ওই দিনে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা হয়।

৮. শায়খ হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত খতীব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বশীর থেকে, তিনি আলী ইবনে ওমর হাফিয এবং আবু নসর হাবশূন ইবনে মূসা খালালাহ থেকে, তাঁরা উভয়ে আলী ইবনে সা'ঈদ ওয়াসীলি থেকে। তিনি যমীরাহ ইবনে বরী'আহ কুরাইশী থেকে, তিনি ইবনে শাউ'য, আল-ওয়াররাক এবং শহর ইবনে হাওশাব থেকে, তাঁরা সকলে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখে রোযা রাখবে, তার আমলনামায় ৬০টি রোযার সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। [এটা এমন মহান দিন, যে দিনে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রিসালতের সুসংবাদ নিয়ে হুযুরের খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলো।]

৯. হযরত হুসাইন ইবনে 'আলী ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেন, একদিন আমি কা'বার তাওয়াফ করছিলাম, ওই সময় জনৈক ব্যক্তির আওয়াজ আমার কানে পৌছলো, সে এ কবিতাগুলো পড়ছিলো–

يَا مَنْ يُجِيْبُ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلَمِ يَا كَاشِفُ الْكُرْبِ وَالْبَلْوَي مَعَ السَّقَمِ
قَدْ بَاتَ وَفْدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ وَنَحْنُ نَدْعُوْا وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمِ
هَبْ لِي لِجُوْدِكَ أَخْطَأْتُ مِنْ جُرَمٍ يَا مَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ الْخَلْقُ بِالْكَرَمِ
إِنْ كَانَ عَفْوُكَ لَمْ يَسْبِقْ لِمُجْرَمٍ فَمَنْ يَجُوْدُ عَلَي الْعَاصِيْنَ بِالنِّعَمِ

"হে অন্ধকার রজনীতে ব্যথাতুর মানুষের প্রার্থনা কবূলকারী, হে অসুস্থ ব্যক্তির বিপদ দূরীভূতকারী, তোমার একদল প্রেমিক বায়তুল্লাহ ও হেরম শরীফে রাত অতিবাহিত করছে। আমরা প্রার্থনা করছি যে, আল্লাহ স্বীয় বদান্যতার গুণে আমাদের গুনাহ ক্ষমা

করুন! হে দয়াময়, তুমি তো দয়াকারী। তোমার রহমত পাপীদের উপর কেন প্রাধান্য পাচ্ছে না এবং তাদের পাপগুলো স্বীয় রহমত দ্বারা কেন ক্ষমা করছো না।"

হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা বললেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বললেন, হে হুসাইন! তুমি কি ওই লোকের আহাজারি শুনো নি যে নিজ গুণাহের জন্য কান্নাকাটি করছে। এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করছে। তুমি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আস। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, এক সুশ্রী ও সুন্দর পোশাক পরিহিত লোক বসে আছে, যার ডান হাত অবশ। আমি তাকে বললাম, তোমাকে হযরত আলী স্মরণ করছেন। যখন ওই ব্যক্তি উপস্থিত হলো, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হও, তোমার এ অবস্থা কেন? তখন সে কেঁদে বললো, আমীরুল মু'মিনীন! ওই ব্যক্তির কী অবস্থা হতে পারে যাকে পাপের কারণে পাকড়াও করা হয়েছে, এবং স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি তার নাম জানতে চাইলে বললো, আমার নাম 'মানাযিল ইবনে লাহিক।' অতঃপর তিনি তার বিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো, আমি বিলাসী জীবন-যাপনে সারা আরবে প্রসিদ্ধ ছিলাম। যৌবনের নেশায় সর্বদা মাতাল ছিলাম। উদাসীনতার মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলাম। তাওবা করতাম কিন্তু তা কবূল হতো না, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েও বিফল মনোরথ হতাম। রজব ও শা'বানের মতো পবিত্র মাসে যখন আমি গুনাহে লিপ্ত হতাম তখন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ওই গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন, তোমার আচরণে অনেকের হৃদয় কষ্ট পাচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যধন্য ফিরিশতা বলছেন, হত্যা হারাম, এইসব ফিরিশতাও তোমার এ গর্হিত আচরণে অসন্তুষ্ট।

আমার পিতা যখন কঠোর হস্তে আমাকে বাঁধা দিতে চাইতেন, তখন আমি তাকেও প্রহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতাম না। একদিন লোকেরা ধরে আমাকে তার কাছে নিয়ে যায়, তিনি নিরূপায় হয়ে বললেন, যতোদিন আপন ছেলে সৎপথে আনতে পারবো না এবং তার গুনাহগুলো ক্ষমা করাতে পারবো না, ততোদিন আমি রোযা রাখবো। নামায পড়বো। ঘুমাবো না। তিনি এক সপ্তাহ রোযা রাখলেন। তারপর এক বিচিত্র উটে চড়ে মক্কা গিয়ে পৌছলেন আর আমাকে বললেন, আমি কা'বা শরীফে গিয়ে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো। তিনি কা'বা শরীফে গিয়ে কা'বার গিলাফ ধরে আমার জন্য এ বলে বদ-দোয়া করলেন–

Scanned by CamScanner

يَا مَنْ اِلَيْهَ أَلَّي الْحُجَّاجِ مِنْ بُعْدِ　　يَرْجُوْنَ لُطْفَ عَزِيْزٍ وَّاحِدٍ صَمَدِ
هَذَا مَنَازِلُ وَلاَ يَرْتَدُّ عَنْ عَقِيْقِيْ　　تَخُذْ بِحَقِّيْ يَا رَحْمَنُ مِنْ وَلَدِيْ
وَشَلَّ مِنْهُ بِجُوْدٍ مِنْكَ جَنَانِيَهُ　　يَا مَنْ تَقَدَّسَ لَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَلِدْ

ওই মহান সত্তার শপথ! যিনি পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দোয়া শেষ হবার আগেই আমার ডান হাত অবস হয়ে যায়। আমি হেরেমের শুষ্ক কাঠের মতো দূর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে থাকি। লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় আমার পাশ দিয়ে চলাফেরা করার সময় বলে থাকে, ইনি ওই লোক, যার ব্যাপারে তার পিতার দোয়া কবূল হয়েছে। হযরত আলী বললেন, তারপর তোমার পিতা তোমার জন্য কি করলো। সে বললো, আমি আমার পিতার কাছে আবেদন করলাম, যেখানে গিয়ে তুমি আমার জন্য বদ-দোয়া করেছে, সেখানে নিশ্চয় আমার জন্য মঙ্গলের দোয়াও করুন। তিনি আমার আবেদনে সাড়া দিলেন। আমরা উভয়ে একটি উটনীর উপর চড়ে কা'বা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে 'এরাক উপত্যকায় এক গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পাখি উড়াল দিলো, পাখির পাখার শব্দে তিনি উটনী থেকে পড়ে যান এবং ওই খানেই ওফাত বরণ করেন।

হযরত 'আলী রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমাকে এমন দোয়া বলবো, যার ব্যাপারে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে দুঃখে থাকবে, তার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। যে অভাবগ্রস্থ লোক এ দোয়া পড়বে, আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্য্য দান করবেন। হুসাইন ইবনে আলী বলেন, তিনি তাকে ওই দোয়া শিখিয়ে দিলেন। তখন ওই লোক এ দোয়া ওই সময় পড়লেন, যখন লোকেরা গভীর নিদ্রায় বিভোর। তখন অদৃশ্য থেকে তাকে বলা হলো, তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তুমি এ দোয়ার মধ্যে এমন এক পবিত্র নাম পড়েছো, যা তাঁর মহান দরবারে কখনো রদ হয় না। তারপর আমাকে নিদ্রা পেয়ে বসলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম এবং এ দোয়া তাঁর সম্মুখে পড়লাম। হুযূর ইরশাদ করলেন, আলী ঠিক বলেছেন। এ দোয়ায় ইসমে আযম আছে। এটা অবশ্যই কবূল হবে। আমি আরয করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কতই না উত্তম হতো, যদি আপনি নিজ বরকতময় যুবানে আমাকে তা' শুনান। হুযূর বললেন, তুমি আমার সাথে পড়-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ يَا عَالِمَ الأُمُوْرِ الخَفِيَّةِ وَيَا مَنِ السَّمَاءُ بِقُدْرَتِهِ مَبْنِيَّةٌ وَ يَا مَنِ الأَرْضُ بِعِزَّتِهِ مَدْحِيَّةٌ وَيَا مَنِ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِنُوْرِ جَلاَلِهِ مُشْرِقَةٌ مُضِيَّةٌ، وَيَا مُقْبِلُ عَلَي كُلِّ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ زَكِيَّةٍ وَيَا مُسْكِنُ رُعْبَ الخَائِفِيْنَ وَأَهْلَ التَّقِيَّةِ وَيَا مَنْ حَوَائِجَ الخَلْقِ عِنْدَهُ مُقْضِيَّةٌ، وَيَا مَنْ نَجَي يُوْسُفَ مِنْ رَقِّ الْعُبُوْدِيَّةِ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّابٌ يُنَادِي وَلاَ حَاجِبٌ يُغْشَي وَلاَ وَزِيْرٌ الْعَطِي وَلاَ غَيْرُهُ رَبٌّ يُدْعَي وَلاَ يَزْدَادُ عَلَي كَثْرَةِ الحَوَائِجِ اِلاَّ كَرَمًا وَجُوْدًا وَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْطِنِي سَوَالِي إِنَّكَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

ওই ব্যক্তি বললো, তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। হযরত 'আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলতেন, এ দোয়া দ্বারা আল্লাহর কাছে মর্যাদা প্রার্থনা করো। এটা আরশের ধন-ভান্ডার থেকে একটি ধন-ভান্ডার।'

১০. হযরত আবু নসর মুহাম্মদ স্বীয় শ্রদ্ধেয় পিতা থেকে হযরত 'আতা ইবনে লীবাদ ও উম্মে সালমাহ্ রাদিআল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে ততোধিক রোযা রাখতেন না, যতোধিক রোযা শা'বান মাসে রাখতেন, কারণ যে ব্যক্তি ওই বছর মৃত্যুবরণ করতো তার নাম শা'বানের মৃত্যুবরণকারীদের সাথে লিখা হতো।

১১. হযরত আবু নসর স্বীয় পিতা থেকে হযরত সাবিত এবং হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুমার সনদে বর্ণনা করেন, হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, রোযার মধ্যে উত্তম রোযা কোনগুলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, রমযানের সম্মানার্থে শা'বান মাসে রোযা রাখা।

১২. হযরত আবু নসর স্বীয় পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ফারসী থেকে তিনি আহমদ ইবনে সাবাহ আবু শুরায়হ থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারুক থেকে, তিনি হাজ্জাজ আল-হাররাহ থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইবনু কাসীর থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি হযরত আয়শা সিদ্দীকাহ্ রাদিআল্লাহু আনহা

থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘর থেকে কোথাও চলে যান, আমি তাঁর তালাশে বের হলাম। হঠাৎ হুযূরকে জান্নাতুল বাকীতে আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। হুযূর আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি এ চিন্তা করছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার উপর অবিচার করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মনে করছিলাম যে, আপনি অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে গেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং কলব গোত্রের বকরীর পশম পরিমাণ পাপীর পাপ ক্ষমা করে দেন।

১৩. আবু নসর স্বীয় পিতা থেকে, আর তিনি হযরত মালিক ইবনে আনাস থেকে, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ্ থেকে, আর তিনি হযরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহার সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হুযূরকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা চারটি রাতে রহমতের দ্বার খুলে দেন। (তা হচ্ছে) ১. 'ঈদুল আযহার রাত, ২. ঈদুল ফিতরের রাত, ৩. শা'বানের মধ্যবর্তী রাত। ওই রাতসমূহে লোকদের বয়স বৃদ্ধি হয়, জীবিকা প্রাচুর্য হয়, হাজীদের মধ্যে গণ্য হয়। আর ৪. আরাফাতের দিবস। সূর্য উদয় পর্যন্ত এ কাজ হতে থাকে।

১৪. হযরত আবু নসর নিজ পিতা থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তা'আলা আপন সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন। এবং তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। এভাবে (রমযানের) প্রতিটি দিবসে দশ লক্ষ বান্দাকে দোযখ থেকে রেহাই দিয়ে দেন।

১৫. আবু নসর নিজ পিতা থেকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় আর দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৬. শায়খ আবুল বারাকাত, আহমদ ইবনে আলী হাফিয থেকে হযরত আবু সা'ঈদ খুদুরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযান হচ্ছে সমস্ত মাসের সরদার। ওটার সম্মান জিলহজ্জ থেকেও উত্তম।

১৭. শায়খ আবুল বারাকাত বর্ণনা করেন যে, হযরত ফযল ইবনে মুহাম্মদ কিসার ইস্পাহানী বিভিন্ন সূত্রে হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত দিনের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) ১০ দিন। জিহাদের দিনগুলোও ওই দিনগুলোর সমকক্ষ হবে না। কিন্তু (এ দিবসগুলোর ফযিলত ওই লোকেই অর্জন করে) যে স্বীয় চেহারা ধূলায় মলিন করেছে।

১৮. শায়খ আবুল বারাকাত হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জিলহজ্জের ১০ম তারিখের নেক আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আল্লাহ রাস্তায় জিহাদও উত্তম নয়? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নয়, তবে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ ও সম্পদ উভয় জিহাদে উৎসর্গ করে, তবে তা উত্তম।

১৯. শায়খ আবুল বারাকাত হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহুর সনদে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি জিলহজ্জে মাসের ১০টি রোযা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একবছর রোযা পালন করার সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন।

মুহীউদ্দীন (দ্বীনের পুনর্জীবিতকারী) উপাধির কারণ

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুকে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর আপনাকে 'মুহীউদ্দীন' বলে ডাকা হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ৫১১ হিজরীতে খালি পায়ে আমি বাগদাদের দিকে আসছিলাম। তখন রুগ্ন শীর্ণকায় দূর্বল গায়ের রং বিকৃত এক লোককে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখি। সে আমাকে আস্সালামু আলাইকুম বলে আমার নাম ধরে ডাকলো এবং আমাকে তার কাছে যেতে বললো। যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম সে আমাকে মাটি থেকে তুলতে বললো। আমি তাকে হাত ধরে তুলতেই তার শরীর ভাল হয়ে যেতে লাগলো, শরীরের রং ও গড়ন সুস্থ মানুষের মতো হয়ে গেলো। আমি দেখে ভয় পেলাম। সে আমাকে বললো, আপনি কি আমাকে চিনেন? আমি চিনি না বলে উত্তর দিলে সে বলতে

Scanned by CamScanner

লাগলো, আমি হলাম দ্বীন, যাকে আপনি দেখছেন। আমি বর্তমান যুগে খুব নাজুক অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রচেষ্টায় আমাকে নতুনভাবে জীবন দান করেছেন। [অতঃপর আপনি 'মুহীউদ্দীন' বা দ্বীন সঞ্জীবিতকারী] নামে অভিহিত হবেন। তারপর হযরত গাউসুল আযম বাগদাদের জামে মসজিদে গমন করলে জনসাধারণ তাঁকে 'মুহীউদ্দীন' নামে সম্বোধন করতে লাগলেন। এবং পরবর্তীতে তিনি এ উপাধিতে পরিচিত হন।]

হযরত শায়খ আবু মাদ্ইয়ান শু'আইব এবং হযরত গাউসুল আযম

হযরত আবু সালিহ মাগরিবী বলেন, আমাকে হযরত আবু মাদ্ইয়ান রাহ্মতুল্লাহি আলাইহি বললেন, বাগদাদে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে তরীকত বা তাসাউফের শিক্ষা অর্জন কর। আমি বাগদাদে গেলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমার সারা জীবনে তাঁর মতো প্রভাববিস্তারকারী লোক দেখেনি। তিনি আমাকে লাগাতার ১২০দিন চিল্লা সাধনা করান। তারপর আমাকে কিবলার দিকে তাকাতে বললেন। আমি বাগদাদে বসে শায়খ আবু মাদইয়ানকে দেখলাম। হুযূর বললেন, তুমি কি শায়খ আবু মাদইয়ানের কাছে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও? আমি শায়খ মাদইয়ানের কাছে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলাম। তিনি বললেন, এক কদমে যেতে চাও, না যেভাবে এসেছিলে সেভাবে? আমি আরজ করলাম, যেভাবে এসেছিলাম। তিনি বললেন, এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এবং আরো বললেন, যতোক্ষণ তুমি এ ধাপ আরোহণ করবেনা, ততোক্ষণ 'ফকীরী' অর্জন সম্ভব নয়। এটা তাওহীদের ধাপ। যা প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতাকে মুছে দেয়। আমি আরজ করলাম, এ পথে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আমার প্রতি একবার তাকালেন, তখন আমার হৃদয় সমস্ত কুপ্রবৃত্তি ও উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেলো। আমি অনুভব করলাম যে, আমার হৃদয়ের যাবতীয় কালিমা ধুয়ে মুছে চলে গেছে। আমি ওই বাতিনী নূর দ্বারা এখনো প্রত্যেক কিছু অবলোকন করি।

প্রথম হজ্ব

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি প্রথমবার বাগদাদ থেকে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জে যাওয়ার সময় একাকী ছিলাম। যখন আমি 'মানাতু উম্মুল কুরআন' নামক স্থান পৌঁছায়, সেখানে শায়খ 'আতা ইবনে মুসাফিরের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি, তিনিও একাকী হজ্জে

যাচ্ছিলেন। তিনি তখন যুবক। তিনি আমাকে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আর আপনার সাথে কে আছেন? আমি বললাম, মক্কা শরীফে একাকীই যাচ্ছি। সুতরাং আমরা ওখান থেকে একসাথে গন্তব্যের দিকে চললাম। পথিমধ্যে বোরকা পরিহিত ক্ষীণকায় এক মহিলা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, হে যুবক, তুমি কোত্থেকে আসছো। আমি বললাম, আমার জন্মভূমি গীলান। সে আরো বললো, তুমি আমাকে আশ্চর্য করেছো। আমি সিরিয়ায় ছিলাম। তখন আমি জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরে তাজ্জাল্লি করেছেন এবং স্বীয় করুণায় এমন সম্মান দান করেছেন যা এযুগে অন্য কারো ভাগ্যে জুটে নি। এ জন্য তোমাকে দেখার আমার ইচ্ছা হলো। তারপর তিনি আরো বললেন, আমিও আপনাদের সাথে যাবো। রোযা-ইফতার একসাথে করবো। আমরা উভয়ে রাস্তার এক পাশে আর ওই মহিলা অন্য পাশে চলতে লাগলাম। সন্ধ্যায় আসমান থেকে চয়টি রুটির একটি পাত্র অবতারণ হলো। সাথে সিরকা ও সবজীও ছিলো। হাবশী মহিলাটি বললো, আল্লাহ আমার সম্মান রেখেছেন, কারণ প্রতিদিন আমার জন্য দু'টি রুটি প্রেরণ করতেন। আমরা জনে দু'টি করে রুটি খেয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম। তারপর আমরা তিন গ্লাস এমন মিষ্টি পানি পেলাম, পার্থিব জগতে এমন পানির দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব নয়। এ ঘটনার পর ওই মহিলা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান।

যখন আমরা মক্কায় পৌঁছায় এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শায়খ 'আদীর উপর নূরের তাজাল্লি বর্ষিত হতেই তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। লোকেরা বললো, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু ওই মহিলা আগ বাড়িয়ে তাকে দোলা দিলো এবং বললো, যে আল্লাহ তোমাকে মেরেছে, তিনি জীবিতও করতে পারেন। তিনি এমন পবিত্র সত্তা, যার সামনে দুনিয়ার কোন কিছুই স্থির থাকতে পারে না। তাঁর গুণাবলীর তাজাল্লি প্রকাশের সময় সৃষ্টিজগত স্থির থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি সাহায্য করেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে বিবেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানীদের বিবেক হয়রান হয়ে যায়।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ওই তাওয়াফে আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লি আমার উপরও অবতীর্ণ হয়। আমাকে এ বলে সম্বোধন করা হয় যে, 'আবদুল কাদের বাহ্যিক নির্জনতা পরিহার কর' তাওহীদি একাকিত্ব ও নির্জনতা গ্রহণ কর। তবে আমি স্বীয়

Scanned by CamScanner

নিদর্শনাবলী থেকে কিছু আশ্চর্য নিশানা তোমাকে দেখাবে। নিজ ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার উপর স্থির কর না। ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দিও। আমার দান ছাড়া অন্য কারো দান গ্রহণ করবে না। আমার দর্শন তোমার জন্য সর্বদা থাকবে। আর খিদমতে খালকে (সৃষ্টির সেবায়) নিজেকে আত্মনিয়োগ কর। কারণ, আমার অনেক বান্দা তোমার কাছে ফয়েয (আধ্যাত্মিক করুণা) লাভ করে ধন্য হবে। তারা আমার নৈকট্য অর্জন করবে।

ওই মহিলা আমাকে দেখে বললেন, আমার জানা নেই আজকে তুমি কোন অবস্থায় আছো। তবে এতটুকু দেখছি যে, নূরের তাবু তোমার মাথার উপর রয়েছে। তোমার মতো লোকের হালসমূহ জানার জন্য লোকেরা আশা পোষণ করে থাকে। এটা বলেই তিনি চলে গেলেন। তারপর আমি তাকে কোনদিন দেখেনি।

শায়খ আবু হাফ্স ওমর ইবনে মাসাউদ ইবনে বায্যায বাগদাদী লিখেছেন, কদীবুল বয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে হযরত আবদুল কাদের জিলানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, তিনি আল্লাহর নৈকট্যধন্য ওলী। আল্লাহর রহমের ধারক এবং মজবুত চিত্তের অধিকারী। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি তো তাঁকে কখনো নামায পড়তে দেখেনি? তখন তিনি বললেন, তিনি এমন জায়গায় নামায পড়েন যেখানে তোমাদের দৃষ্টি পৌছাতে পারি নি। এমন কোন দিন ও রাত অতিবাহিত হয় না, যে সময় তিনি নিজ ফরয কার্যাদি আদায় করেন না। আমি দেখেছি যে, যখন তিনি মূসল শহরে নামায পড়তেন, তখন তাঁর সাজদার স্থান হতো কা'বা শরীফ।

শায়খ আবু হাফস বলেন, একবার শায়খ আলী ইবনে হায়তী অসুস্থ ছিলেন। তিনি নিজ খাদেম আবুল হাসান জাওসকীকে দস্তারখানা বিছাতে বললেন। দস্তারখানা বিছিয়ে চিন্তা করতে লাগলো, উভয়জন তো সম্মানিত, আগে কার সামনে রুটি রাখি। তিনি দস্তারখানের চার পাশে রুটি রাখলেন- যাতে আগে- পরে বুঝা না যায়। হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু খাদেমের এ আচরণে যখন প্রশংসা করলেন, তখন শায়খ আলী হায়তী বললেন, আমি এবং সেউভয়জনতো আপনার খাদিম। এটা আপনার প্রশিক্ষণের প্রভাব।

ইরাকের মরুপ্রান্তরে হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাৎ

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু মিম্বরে বসে বললেন, আমি ২৫ বছর একাকী মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে রিয়াযত (আধ্যাত্ম সাধনা) করেছি। ৪০ বছর ব্যাপী ফজরের নামায ইশার নামাযের ওযূ দিয়ে আদায় করেছি। ১৫ বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের পর থেকে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ফজর পর্যন্ত কুরআন শরীফ খতম করতাম। এক রাত আমার নাফস আমাকে বললো, যদি তুমি কিছুক্ষণ শুয়ে তারপর উঠতে কতই না উত্তম হতো। এটা অন্তরে আসার সাথে সাথে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। কুরআন শরীফ পড়া আরম্ভ করলাম। এভাবে সমস্ত কুরআন পড়ে শেষ করলাম।

অনেক সময় আমাকে ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত বিনা পানাহারে থাকতে হতো। ওই সময় ইবলিশ আমার কাছে আসতো। আমার তাড়া খেয়ে পালিয়ে যেতো। দুনিয়া তার সমস্ত জীবন উপকরণ, সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হতো, কিন্তু আমি তার দিকে চোখ তুলেও থাকাতাম না।

আমি বুরজে আজমীতে ১১ বছর অবস্থান করেছি। ওই সময় আমি এ বলে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পানাহার করার জন্য বলা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি না কিছু খাব, না পান করবো।

এমতাবস্থায় আমি পানাহার না করে ৪০ দিন অতিবাহিত করি। তখন এক ব্যক্তি এসে আমার সামনে রুটি ও পানি রেখে চলে যায়। আমার নফস তা থেকে কিছু খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে বসলাম যে, আল্লাহ শপথ, যতক্ষণ আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, কোন কিছু পানাহার করতে উদ্যত হবো না। ওই সময় আমার নফস 'খিদে খিদে' বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু আমি তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করলাম না। হযরত আবু সা'ঈদ মাখযূমী রাদিআল্লাহু আনহু ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই চিৎকার শুনে বললেন, আবদুল কাদের এ কিসের শোরগোল? আমি বললাম, হুযূর এটা নফসের অস্থিরতা কিন্তু আমার রূহ প্রশান্তিতে রয়েছে এবং আমার আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। আমাকে 'বাবে ইযজ'- এর দিকে যেতে বলে তিনি চলে গেলেন। তখন আমার কাছে হযরত আবুল আব্বাস খিযির আলাইহিস সালাম তশরীফ আনলেন এবং বললেন, উঠুন! এবং আবু সাঈদের কাছে যান। যখন আমি সেখানে পৌছায় তখন তিনি নিজ ঘরের দরজায় আমার অপেক্ষা ছিলেন

Scanned by CamScanner

আর বললেন, আবদুল কাদের আমার বলার কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো না, হযরত খিযিরকে আসতে হলো। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে রুটি খাওয়ালেন। আমি তৃপ্তি হলাম। তারপর তিনি নিজ হাতে 'খিরকা' (তরীকতের বিশেষ পোশাক) পরালেন।

ওই ঘটনার পূর্বে এক সফরে আমি এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি, যার সাথে পূর্বে কোন পরিচয় ছিলো না। সে আমাকে বললো, তোমার কি কারো সাথে থাকার ইচ্ছে হচ্ছে। যখন 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিলাম তখন বললেন, তুমি আমার কথার বিরোধিতা তো করবে না? আমি ওয়াদা করলাম। তখন একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখানে বসে থাক, আমি আসছি। এভাবে এক বছর চলে গেলো সে আসলো না। এক বছর শেষে কিছুক্ষণের জন্য সে আমার কাছে এসে বসলো এবং চলে যাওয়ার সময় বললো, আমি দ্বিতীয়বার না আসা পর্যন্ত এখান থেকে যাবেন না। এক বছর পর পুনরায় আসলেন এবং আমাকে ওই জায়গায় দেখে বললেন, আমি পুনরায় না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাবেন না। তারপর তিনি একবছর অদৃশ্য থাকার পর সাথে কিছু দুধ ও রুটি নিয়ে আসলেন। আমরা দু'জনে তা তৃপ্তি করে খেলাম। আর তিনি আমাকে বললেন, এখন তুমি বাগদাদে চলে যাও এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে হিদায়তের পথে আসার জন্য আহ্বান কর।

আমরা উভয়ে বাগদাদে প্রবেশ করার সময় কেউ তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, উফ, তিন বছর পর্যন্ত আপনি কী খেয়েছিলেন। তিনি বললেন, লোকদের ঝুটা খেয়ে থেকেছি।

খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহর উপস্থিতি

শায়খ আবুল আব্বাস হুসাইনী মুসলী বলেন, আমি বাগদাদে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মাদ্‌রাসায় উপবিষ্ট ছিলাম। দেখলাম আব্বাসী খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহ্ আল মুযাফ্ফর ইউসুফ আব্বাসী এসে হুযূরকে সালাম করে মজলিসে বসলেন এবং দশ থলে স্বর্ণমুদ্রা তাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। হুযূর বললেন, আমার এ মুদ্রার কোন প্রয়োজন নেই। যখন খলীফা বার বার অনুরোধ করলেন তিনি দু'হাতে দু'টি থলে নিয়ে মোচড় দিতেই তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। হুযূর বললেন, আবু মুযাফ্ফর, জনসাধারণের রক্ত জমা করে আমার কাছে নিয়ে আসতে তোমার

কি লজ্জা লাগে নি? আল্লাহর শপথ, যদি আমার নিকট নবী বংশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকতো, তবে এ রক্ত এমনভাবে প্রবাহিত করতাম যেন তা তোমার রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌছতো। এ ঘটনা দেখে খলীফা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

শায়খ আবুল আব্বাস হুসাইন আরো বলেন, একদিন আমি খলীফাকে হুযুরের খিদমতে দেখলাম। খলীফা বললো, হুযূর আমাকে এমন কোন কারামত দেখান, যাতে আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে। হুযূর বললেন, তুমি কী দেখতে চাও? খলীফা বললেন, আমার এখন আপেল দরকার। বাগদাদে ঐ মৌসূমে আপেল কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। হুযূর হাত বাড়িয়ে দু'টি আপেল নিলেন। একটি খলিফাকে দিলেন আর একটি নিজে রাখলেন। যখন তিনি নিজের ভাগের আপেলটি ভাঙ্গলেন তা হতে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বের হলো আর যখন খলিফা নিজেরটা ভাঙ্গলেন, তখন তার আপেলের ভেতর পোকা দেখতে পেলেন। খলীফা আশ্চর্য হয়ে বললেন, হুযূর ব্যাপার কি? তিনি বললেন, জালেমের হাত স্পর্শ করার দরুন ফলে পোকা পড়ে যায়।

আবু গালিব এবং হযরত গাউসুল আযম

একদল মাশায়েখে কিরাম নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন বাগদাদের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবু গালিব হুযুরের দরবারে এসে বললেন, হুযূর, আপনার সম্মানিত দাদা বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কেউ কাউকে দাওয়াত করলে তা কবূল করা উচিত।' আমার গরীবালয়ে আপনার পদধুলি ফেলে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই। হুযূর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন। তিনি নিজ খচ্চরের উপর সাওয়ার হলেন, আর শায়খ ইবনে হায়তী তাঁর ডান রেকাব ধরে চললেন এবং ওই ব্যবসায়ীর ঘরে গিয়ে পৌছলেন। গিয়ে দেখলেন, বাগদাদের বড় বড় শায়খ-ই তরীকত ও আলিমগণের এক বিরাট সমাবেশ। যেনো সকলে হুযুরের অপেক্ষায় আছেন। তারপর দস্তারখানা বিছানো হলো, যাতে নানা ধরণের খাবার পরিবেশন করা হলো। ওই সময় মুখ বন্ধ একটি বড় মুটকা দস্তারখানের এক পার্শ্বে রাখা হলো। আবু গালিব বললেন, বিসমিল্লাহ বলুন। (খাবার শুরু করুন)। কিন্তু হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। না নিজে খেতে শুরু করলেন, না তাঁর সাথে উপবিষ্ট মেহমানদেরকে খেতে

Scanned by CamScanner

নির্দেশ দিলেন। তাঁর রূহানী প্রভাবের উপস্থিতিতে সকলে খাবারের প্রতি হাত না বাড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন।

এ ঘটনা বর্ণনাকারী বললেন, অনেক্ষণপর তিনি আমাকে এবং শায়খ হায়তীকে ওই মটকাটি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো মটকা তাঁর সামনে রাখা হলো। মটকার মুখ খোলার পর দেখলাম, তাতে আবু গালিবের পক্ষাঘাতগ্রস্থ, অন্ধ ও লুলা ছেলে। তিনি দেখে বললেন, বৎস, উঠো এবং সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যাও দেখি। অসুস্থ ছেলেটি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে দৌড়াতে লাগলেন, ছেলেটাকে দেখতে মনো হলো ইতোপূর্বে তার কোন রোগই ছিলো না। এটা দেখে উপস্থিত লোকদের মধ্যে শোরগোল ছড়িয়ে পড়লো। তিনি নিশ্চপে মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছু খেলেন না।

কতেক শিয়া কর্তৃক পরীক্ষা

একবার কিছু দুষ্টপ্রকৃতির শিয়া তাঁর কাছে মুখ বন্ধ দু'টি ঝুড়ি নিয়ে এসে বললো, বলুন তো এ ঝুড়ি দুটির মধ্যে কী আছে? তিনি চেয়ার থেকে নেমে আসলেন এবং একটি ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন, এতে একজন লুলা ছেলে রয়েছে। নিজ সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাককে বললেন, এটার মুখ খোল এবং ওই ছেলেকে দাঁড়াতে বল। তিনি ওই লুলা ছেলেকে দাঁড়াতে বলতেই ছেলেটি দৌড়াতে লাগলো। অপর ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন, এতে একজন সুস্থ ছেলে রয়েছে। ঝুড়ির মুখ খোলে তাকে নির্দেশ দিলেন, ঝুড়ি থেকে বের হয়ে বসে পড়তে। যখন ছেলেটি বসে পড়লো তখন সমস্ত শিয়া তাওবা করলেন। ওই দিন তাঁর মজলিসে ভয়ে তিনজন লোক মারা যায়।

সম্মানিত শায়খগণের একটি দল বর্ণনা করেছেন, এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে হুযুরের কাছে আসলেন এবং বললেন, হুযূর আমার এ ছেলে আপনার প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করেন। তাই আমার অধিকার ত্যাগ করে তাকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। আপনি তাকে কবূল করে তাকে ইবাদত–বন্দেগী ও সাধনার মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

অনেকদিন পর ওই মহিলা হুযুরের দরবারে আসলেন এবং নিজ ছেলেকে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টে মুখ ফেকাশে ও হলুদবর্ণ দেখলেন এবং আরো দেখলেন ছেলে শুধু যবের রুটি উপরই কালাতিপাত করছে। যখন ওই মহিলা হুযূর গাউসুল আযমের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি প্লেটের মধ্যে

মুরগীর হাড় পড়ে আছে, যা তিনি খেয়েছিলেন। ওই মহিলা অভিযোগের সুরে বললেন, আপনি তো মুরগী খাচ্ছেন আর আমার ছেলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তিনি হাড়গুলোর উপর হাত রেখে বললেন, 'আল্লাহর হুকুমে উঠে', একথা বলা মাত্রই ওই হাড়গুলো জীবন্ত মুরগী হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করতে লাগলো। হুযূর বললেন, যখন তোমার ছেলে এ মর্যাদায় পৌছবে, তখন মুগরীর মাংস খেতে কোন অসুবিধা নেই।

এক অনারবীয় কাফেলাকে সাহায্য

কতেক শায়খ-ই তরীকত বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে বাগদাদস্থ মাদরাসায় বসা ছিলাম। তিনি মজলিস থেকে উঠে নিজ খড়ম পরিধান করলেন এবং ওযূ করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতে লাগলেন। নামায শেষে বিকট শব্দ করে তাঁর একটি খড়ম বাতাসে নিক্ষেপ করলেন। যা মুহূর্তে আমাদের চোখের অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর অপর খড়মটিও নিক্ষেপ করলেন। তাও দেখতে দেখতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর নিজ অবস্থানে বসে পড়লেন। তার এ কাজের প্রকৃত রহস্য জানতে আমাদের কারো সাহস হয়নি। এ ঘটনার এক মাস পর অনারব দেশ থেকে একটি কাফেলা বাগদাদে পৌছালো। তাদের দলনেতা এসে বললো, আমরা হযরত গাউসুল আযমের জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি। হুযূরকে তা বলা হলে হুযূর বললেন, ওই উপহার নিয়ে আসতে বল। ওই কাফেলা এক মন রেশমী কাপড়, পশমী কাপড় এবং অনেক স্বর্ণ দিলেন এবং সাথে ওই খড়ম দু'টিও পেশ করলেন- যা একমাস পূর্বে হুযূর বাতাসে নিক্ষেপ করেছিলেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, আমরা ৩ সফর রবিবার এক মরুভূমির পথে সফর করছিলাম। হঠাৎ আমাদের উপর আরব ডাকাতের একদল হামলা করে বসে। তাদের দু'জন সরদার ছিলো। তারা আমাদের কাফেলার সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে নেয় এবং অনেককে মেরেও ফেলে। কাফেলা লুণ্ঠিত হওয়ার পর পার্শ্বের এক উপত্যকায় গিয়ে অবস্থান করছিলো। সেখানে আমরা ডাক দিয়ে বললাম, যদি এ বিপদের সময় শায়খ আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে আমরা তাঁর খিদমতে এ উপহার পেশ করবো। তখনিই উপত্যকায় এমন ডাক-চিৎকার শুনা গেলো- যদ্দরুণ গোটা উপত্যকা কেপে উঠলো। ডাকাতরা ভয়ে

Scanned by CamScanner

কাতর হয়ে পড়লো। আমরা মনে করেছি, হয় তো অন্য ডাকাতের দল তাদের উপর হামলা করে বসেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কয়েকজন ডাকাত ভয়ে কেপে কেপে আমাদের কাছে আসলো আর বলতে লাগলো, আপনাদের মাল-সম্পদ নিয়ে নিন। আর ওইখানে গিয়ে দেখুন, আমাদের উপর কী বিপদ গেছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, দু'ডাকাত সরদারের লাশ পড়ে আছে। আর উভয়ের লাশের পাশে দু'টি খড়ম পড়ে আছে। আমাদের মাল-সম্পদ ফেরৎ দিতে গিয়ে তারা বললো, এতে কোন গুঢ় রহস্য নিহীত আছে, যা আমাদের বুঝা আসছে না।

নিশিরাতে নিহাওয়ান্দ ভ্রমণ

হযরত আবুল হাসান বাগদাদী বলেন, আমি বাগদাদ মাদ্‌রাসায় হযরত মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে পড়তাম। আমি প্রায় রাতে জাগ্রত থাকতাম, যেন হুযূরের কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি। এক রাতে তিনি ঘর থেকে বাইরে বের হলেন। আমি তাঁকে পানির লোটা দিলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। তিনি মাদরাসায় ফটকে পৌছতেই তা অবলীলায় খুলে যায়। যখন তিনি বাইরে তশরীফ নিয়ে যান, আমিও নিশ্চুপে তাঁর পিছু নিলাম। আমার মনে হলো, তিনি আমার সম্পর্কে জানেন না। যখন তিনি শহরের ফটকে পৌছালেন, তাও অবলীলায় খুলে যায়। আমরা কিছু দুর গেলে একটি শহর দেখতে পেলাম। এ শহর ছিলো আমার কাছে অচেনা। আমরা একটি ঘরের নিকট গিয়ে পৌছলাম। দেখি ঘরের আঙ্গিনায় ৬জন লোক বসা। তাঁরা হুযূরকে দেখে মাত্রই সালাম করলেন। আমি ঘরের একটি পিলার ঘেষে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম যা অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ওই মুহূর্তে একজন লোক কান্নার শব্দের দিকে এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে কাঁধে করে বাইরে নিয়ে আসলো। বড় বড় গোঁফধারী এক ব্যক্তি বাইর থেকে এসে তাঁর সামনে দু'জানু হয়ে বসে পড়লেন। হুযূর তাকে কালেমা শরীফ পড়ালেন এবং লম্বা গোঁফ পরিস্কার করিয়ে খিরকা পরিধান করালেন এবং তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ। আর বললেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, ইনি মৃত ব্যক্তির আবদাল হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। সে বললো, মাথা পেতে মেনে নিলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সেখানে থেকে বের হয়ে আসলেন। আমিও হুযূরের পিছু নিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগদাদে এসে পৌছালাম। আমি মাদরাসায় চলে গেলাম। তিনি নিজ

ঘরে চলে গেলেন। পরের দিন যখন পাঠের আসরে বসলাম, তাঁর রূহানী প্রভাবের ফলে পড়তে পারছিলাম না। তিনি আমাকে বললেন, বৎস ভয় করোনা। পড়তে থাক। আমি তাঁকে শপথ দিয়ে রাতের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি যে শহরে গেছো, তা হচ্ছে নিহাওয়ান্দ। ওই ছয় জন লোক ছিলো আবদাল। আর ক্রন্দনকারী ছিলো ৭ম আবদাল। তাঁর ওফাতের সময় হওয়াতে আমাকে সেখানে যেতে হয়েছে। আর যে তাকে কাঁধে নিয়েছে, সে হচ্ছে হযরত খিযির। তিনি তাকে দাফন করেছেন। আর যে লোককে আমি কালিমা শরীফ পড়িয়েছি সে হচ্ছে তুর্কীস্তানের একজন খ্রিষ্টান। আমি নির্দেশ দিয়েছি, ওই ওফাতপ্রাপ্ত আবদালের ইনি স্থালভিষিক্ত হবেন। সে আমার কাছে তাওবা করেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন সেও তাঁদের সাথে আছেন। এখন তুমি কথা দাও, যেনো এ ঘটনা আমার জীবদ্দশায় কাউকে বলবে না।

একজন মেয়েকে জিন থেকে মুক্তি

আবু সা'ঈদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বাগদাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আমার মেয়ে ফাতিহা ১৬ বছর বয়সে একদিন ঘরের ছাদে উঠলে একজন জিন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনা আমি আমার দয়াবান মুরশিদ হযরত শায়খ সাইয়্যিদ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুকে জানায়। তিনি বললেন, আজ রাতে কারখের বিজন স্থানে অমুখ টিলায় নিজের চতুপার্শ্বে বৃত্ত টেনে বসবে আর বৃত্ত টানার সময় পড়বে, বিসমিল্লাহি আলা নিয়্যাতি আবদিল কাদের। রাতের অন্ধকারে তোমার কাছে জিনদের বিভিন্ন দল আসতে থাকবে। তাদের দেখে ভয় করবে না। শেষ রাতে ফজরের সময় জিনদের বাদশা তোমার কাছে আসবে এবং তোমার কাছে তোমার অভিযোগ জানতে চাইবে। তখন তুমি তাকে বলবে, আমাকে সাইয়্যিদ আবদুল কাদের পাঠিয়েছেন আর আমার মেয়ে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেছে।

তাঁর কথা মতো ওই টিলায় গিয়ে বৃত্ত একে নিলাম। দেখতে কুশ্রী অনেক জিন আমার বৃত্তের চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলো। সবশেষে তাদের বাদশাও একটি ঘোড়ায় চড়ে জিনদের এক বিরাট দল নিয়ে আসলো। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, ভাই! তোমার কি খিদমত করতে পারি? আমি যখন হযরত শায়খের নাম নিলাম, সে সম্মান দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নিচে নেমে

Scanned by CamScanner

পড়লো এবং মাটি চুম্বন করে বৃত্তের বাইরে বসে পড়লো। আর আমার অভিযোগ পেশ করতে বললো।

আমি আমার মেয়ে নিখোঁজ হবার সংবাদ তাঁকে শুনালাম। তখন সে নিজ দলবলের কাছে জিজ্ঞাসা করলো- এ কাজ কে করেছে। যখন সবাই জানে না বলে নিজেদের অজ্ঞাতা প্রকাশ করলো তখন তার সামনে এক অবাধ্য জিনকে উপস্থিত করা হলো- যার কাছে মেয়েটি ছিলো। জিনগণ বললো, এ অবাধ্য জিন চীন দেশের জিনদের একজন। বাদশা বললো, এ মেয়েকে সাইয়্যিদ গাউসুল আযম'র শহর থেকে তুমি কেন ছিনতাই করেছো? সে বললো, তাকে আমার পছন্দ হয়েছে তাই। বাদশা বললো, এ মরদুদের মাথা উড়িয়ে দাও। সুতরাং তাই করা হলো। আর মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আমি বাদশার প্রশংসা করতে গিয়ে বললাম, তোমার মতো বাধ্য জীন কোথাও দেখিনি। সে বললো, কেন হবো না, হযরত গাউসুল আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহি ঘরে বসে অবাধ্যদের প্রতি একটি দৃষ্টি দেওয়া মাত্রই তারা ভয়ে গর্তে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিন ও মানুষের মধ্য থেকে 'কুতুব' নিযুক্ত করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন।

এক সাহিব-ই হাল সম্পর্কে শায়খ ইবনে আলী হায়তীর সুপারিশ

একদিন শায়খ ইবনে হায়তী, হযরত সাইয়্যিদুনা গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর বাড়িতে গেলেন। দেখলেন ঘরের বাইরে এক যুবক অপদস্থ ও অক্ষম অবস্থায় পড়ে আছে। শায়খ ইবনে আলী হায়তীকে দেখে বললো, হুযূরের দরবারে আমার এ দুরবস্থার জন্য সুপারিশ করুন। যখন তিনি হুযূরের কাছে গেলেন তখন ওই যুবকের ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। তখন হুযূর বললেন, তোমার খাতিরে তাকে ক্ষমা করলাম। শায়খ হায়তী ওই যুবককে এ সুসংবাদ দিতেই সে হঠাৎ দু'বাহু নেড়ে বাতাসে উড়ে যায়। হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এ যুবক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এ যুবক বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো আর মনে মনে বলছিলো, বর্তমানে বাগদাদে কোন 'সাহিব-ই হাল' নেই। আমি তার নাফসের অহমিকা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ঐ অবস্থা করেছিলাম।

জামে মসজিদে সাধারণ লোকের ব্যাকুলতা

শায়খ ওমর বায্যায রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন শুক্রবার আমি হযরত সাইয়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে

জামে মসজিদে গেলাম। তখন দেখলাম, কেউ তাঁর প্রতি তাকাবে দূরে সালামও করছে না। আমি মনে মনে এ বলে আশ্চর্য হলাম যে, এখানে এতো লোকের ভিড় অথচ তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও নেই। আমি চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম, তখন তিনি একটু মুচকি হাসতেই সমস্ত লোক তাকে সালাম করতে লাগলো। মানুষের ভিড়ে আমি তাঁর থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম এবং মনে মনে বললাম, ইহার চেয়ে তো পূর্বের অবস্থা উত্তম ছিলো। তখন হুযূর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিই তো এ কথা পছন্দ করছিলে। তুমি কি জান না জনসাধারণের অন্তর আমার হাতে রয়েছে, যখন ইচ্ছা তাদেরকে আমার থেকে ফিরিয়ে দিই।

শায়খ আবুল বাকা মুহাম্মদ ইবনে আযহার বলেন, আমি সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, যেনো আমার সাথে কোন 'রিজালুল গায়ব'-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আশ্চর্য, একরাতে আমি স্বপ্নে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমতুল্লাহি আলাইহির কবর যিয়ারত করতে দেখি। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর কবরের পাশে বসা দেখলাম। আমার অন্তর সাক্ষ্য দিলো যে, ইনি হয়তো 'রিজালুল গায়ব' হবেন। আমি যখন জাগ্রত হলাম, তখন আমার অন্তরে ইচ্ছা জাগলো যেনো আমি তাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পায়। আমি দিনের বেলায় ইমামের কবর শরীফে উপস্থিত হলাম। তখন ওই ব্যক্তিকে কবরের পাশে বসা অবস্থায় দেখলাম। ওই ব্যক্তি যিয়ারত শেষে সেখান থেকে বের হলে আমিও তাঁকে অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। যখন আমি দজলা নদীর পাড়ে গিয়ে পৌছালাম, তখন দেখলাম তাঁর এক কদম গোটা দজলা নদী পার হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি উচ্চস্বরে তাকে শপথ বাক্য শুনিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে একটু দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনার জন্য বললাম। তিনি গতি কমিয়ে বললেন, বলুন! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোন মাযহাবের উপর আছেন। তিনি বললেন, হানিফাম মুসলিমান ওয়া-মা কানা মিনাল মুশরিকীন (আমি হানাফী মুসলমান, মুশরিক নয়)। তাঁর কথায় বুঝে নিলাম তিনি হানাফী মাযহাবের লোক। তিনি এটা বলে চলে গেলেন। আমি এঘটনার ব্যাপারে হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করবো বলে মনে মনে স্থির করলাম। আমি তাঁর মাদ্‌রাসায় পৌছালে তিনি আমাকে ভেতরে আসতে হুকুম করলেন আর বললেন, হে মুহাম্মদ! বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমে আমি ছাড়া কোন আল্লাহর ওলী হানাফী মাযহাব ভুক্ত নেই। এটা বলেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

Scanned by CamScanner

আবু আবদুল্লাহ মুসলী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন শায়খ আবুল ম'আলী বাগদাদী হাম্বলী রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর দরবারে আসলেন আর বললেন, আমার ছেলে মুহাম্মদ ১৫ মাস যাবৎ জ্বরে ভোগছে, কোন মতে জ্বর সারছে না। তিনি বললেন, তার কানে গিয়ে বল, আবদুল কাদের বলছেন তাকে ছেড়ে দজলার দিকে চলে যাও। আমি তাই করলাম। আমার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়। আর খবর আসলো, দজলা এলাকায় জ্বরের প্রকোপ বেড়ে গেছে।

আবু হাফস উমর ইবনে সালিহ বাগদাদী নিজ উটনীকে তাড়িয়ে হযরত গাউসুল আযমের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হুযূর! আমি হজ্জে যেতে ইচ্ছুক, আমার উটনী সফরের উপযুক্ত নয়, অথচ এটা ছাড়া অন্য কোন আরোহীও আমার নেই। হযরত গাউসুল আযম উটনীর কপালের উপর হাত রাখলেন এবং তারপর তাঁর পা দিয়ে স্পর্শ করলেন। ফলে উটনীটি বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌছাতে কোন আরোহীর পেছনে থাকে নি।

হযরত আবুল হাসান ইযজী রাহমতুল্লাহি আলাইহি অসুস্থ হলে, হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহু তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর ঘরে একটি কবুতরী ও ঘু-ঘু পাখি দেখলেন। আবুল হাসান ইয্জী বললেন, এ কবুতরী ৬ মাস হয়েছে ডিম দিচ্ছে না আর এ ঘু-ঘু ৯ মাস হলো শব্দ করছে না। তিনি কবুতরীর পাশে গিয়ে বললেন, নিজ মালিকের উপকার কর। আর ঘু-ঘু কে বললেন, নিজ স্রষ্টার তাসবীহ বর্ণনা কর। ঘু-ঘু ওই দিন থেকে এমনভাবে ডাকতে শুরু করলো যে, বাগদাদবাসী শুনে আনন্দিত হতো আর কবুতরীটি জীবনভর ডিম ও বাচ্চা দিতে লাগলো।

শরীফ হুসাইন মুসলী বলেন, আমি হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর ১৩ বছর খিদমত করেছি। এ সুদীর্ঘ সময়ে আমি তাঁর শরীরে মাছি বসতে দেখেনি। আর না তিনি কোনদিন নাক ঝেড়েছেন, না কোন বড় লোকের সম্মানে দাঁড়িয়েছেন, আর না কোন বাদশার কাছে গেছেন। কোন বিচারকের বিছানায় তিনি কোনদিন বসেন নি। কোন বাদশার ভোজসভায় যোগ দেননি। তিনি বাদশা ও বড়লোকদের বিছানায় আরাম করাকে শাস্তির কারণ মনে করতেন। অনেক সময় বড় বড় মন্ত্রী ও আমীর তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসতেন। তিনি তখন ঘরের ভেতর চলে যেতেন। যখন তারা এসে বসে পড়তো, তখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, যাতে দুনিয়া পূজারীর জন্য দাঁড়াতে না হয়।

হযরত আবু বারাকাতকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কখনো শায়খের কাপড়ে মাছি বসতো কি? তিনি বললেন, আমি কখনো দেখেনি। হযরত গাউসুল আযম এক মজলিসে ইরশাদ করেছেন, মছি আমার কাছে আসবে কেন, আমার কাছে না ইহলৌকিক মিষ্টি আছে, না আছে পরলৌকিক মধু। আমার সব কিছুতেই আল্লাহ আছেন। তিনি নিম্মোক্ত শে'র থেকে তাক্ওয়ার শিক্ষা নিতেন।

وَمَا يَنْفَعُ الْأَعْرَابُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَقِيٌّ وَمَا ضَرَّ ذَا تَقْوَى لِسَانُ مُعْجَمِ

'যদি তাক্ওয়া না থাকে আরবী হয়েও কোন লাভ নেই। আর তাক্ওয়াবানকে অনারবীয় ভাষা কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

সাপ এবং হযরত গাউসুল আযম

আহমদ ইবনে সালিহ ইবনে শাফিঈ' জীলী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন আমি মাদ্রাসা-ই নিযামিয়ায় হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ওই মজলিসে ওই যুগের অধিকাংশ বড় বড় আলিম ও ফকীহগণও উপস্থিত ছিলেন। ওই দিনের আলোচ্য বিষয় ছিলো 'কাযা ও কদর' (তাকদীর সম্পর্কীয়)। তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে এক বড় সাপ ছাদ থেকে পতিত হয়ে তাঁর কোলে গিয়ে পড়লো। সাপটি তাঁর জুব্বার ভেতর ঢুকে সারা শরীর পেঁচিয়ে সিনার দিকে বের হয়ে গলায় চতুর্দিকে পেঁচিয়ে যায়। এ আকস্মিক ঘটনায় মজলিসের সকলে ভয়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু তিনি নিজ অবস্থান থেকে একটুকু সরলেন না এবং বক্তব্যও বন্ধ করলেন না। কিছুক্ষণপর সাপ নেমে গেলো। এবং মাটিতে গিয়ে তাঁর সম্মুখে ফনা তুলে কি যেনো বললো। যা আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর সাপটি চলে গেলে লোকেরা ফিরে আসলো। লোকেরা হুযূরের অবস্থা এবং সাপে তাঁকে কি বললো তা জানতে চাইলো। তখন তিনি বললেন, সাপ বলছিলো, আমি আমার দীর্ঘ জীবনে অনেক আল্লাহর ওলীকে দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো দৃঢ়চিত্ত কাউকে দেখিনি। আমি তাকে বললাম, যখন তুমি ছাদ থেকে পতিত হয়েছো তখন আমি 'কাযা ও কদর' (তাকদীর) বিষয়ের উপর আলোচনা করছিলাম। আমার জানা ছিলো, তুমি তাকদীরের নির্দেশ ছাড়া আমার না উপকার করতে পারবে, না ক্ষতি করতে পারবে। আমি এ আলোচনার কার্যত আমলকারী হতে চেয়েছিলাম। তাই আমি আমার অবস্থানে স্থির ছিলাম।

Scanned by CamScanner

সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাককে সুসংবাদ

আবু যুর'আহ তাহির মুকাদ্দসী বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলছিলেন, আমার আজকের আলোচনা ওই সব লোকের জন্য, যারা কাফ পর্বতের অপর পার্শ্ব থেকে এসে মজলিসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের কদম বাতাসের উপর এবং তাঁদের অন্তর হযরত কুদ্স এ রয়েছে। হতে পারে যে, আনন্দের অতিশয্যে তাঁদের টুপি ও নাক জ্বলে যাবে।

তাঁর সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক[২৪] ওই সময় মিম্বরের খুটির পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বীয় মাথা আসমানের দিকে উঠালেন। কিছুক্ষণপর বেহুশ হয়ে ঢলে পড়লেন। এবং তাঁর নাক জ্বলে উঠলো। হুযূর মিম্বার থেকে নিচে নেমে আগুন নিভিয়ে দিলেন। আর বললেন, আবদুর রায্যাক! তুমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

আবু যুর'আহ বলেন, আমি আবদুর রায্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে কেন পড়লেন। তিনি বললেন, আমি যখন আসমানের দিকে দেখলাম, হাজার হাজার লোক মাথা ঝুঁকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। ওই সব বুযর্গদের সিলসিলা পরম্পরা দিগন্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তঁদের কাউকে আনন্দ প্রকাশার্থে এদিক সেদিক দৌড়াতে দেখছিলাম। অধিকন্তু অধিকাংশ নিজ আসনে কাপতে ছিলো।

হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি জীবনের প্রাথমিক অবস্থার মতো নির্জন মরুভূমি ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, যাতে কোন লোককে আমি না দেখি এবং তারাও আমাকে না দেখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার দ্বারা লোকদের উপকার করা। এ সফরে আমার কাছে পাঁচ শতেরও বেশী ইয়াহুদী ও নাসারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং এক লাখের চেয়েও বেশী দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোক আমার সৎচরিত্রে বিমোহিত হয়ে সাচ্ছা মুসলমানে পরিণত হয়েছে।[২৫]

---

২৪. হযরত সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক ছিলেন তাঁর বড় সন্তান। তাঁর পূর্ণনাম হচ্ছে 'শায়খ তাজ উদ্দীন আবু বক্কর আবদুর রায্যাক। কুনিয়াত আবদুর রহমান ও আনুহু। দ্বীনি শিক্ষার্জন শেষে তাঁর সম্মানিত পিতার মাদ্রাসায় মুফতির পদ অলংকৃত করেন। হযরত গাউসুল আ'যমের মালুযাত সংকলন জালাউল খাতির' তাঁর প্রচেষ্টারই ফসল। এ মালফুযাত তরীকতপন্থীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। [দারাশেকূ কৃত সফীনাতুল আওলিয়া]

২৫. প্রযুক্তিগত এ উন্নতির যুগে কোন বড় থেকে বড় ইসলামী সংগঠন সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধণে এমন বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। যতোটুকু হযরত গাউসুল আ'যম রাদিআল্লাহু আনহু নিজ যুগে

আবু মুহাম্মদ মুফাররাহ ইবনে বাহনান ইবনে বারকাত শায়বানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধি বাগদাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখন বাগদাদের একদল আলিম তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য পালাক্রমে নানা প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতো এবং তাঁকে প্রশ্ন করতো। ওই মজলিসে আমি হাজির ছিলাম। কিছু আলিম মজলিসে এসে বসলেন। আমি দেখলাম, হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর সিনা থেকে নূরের এক রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। ওই রশ্মির আলোতে ওই সম্মানিত আলিমগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন, নিজেদের শরীরের কাপড় ফাটতে লাগলেন, মাথার পাগড়ী মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। আর মিম্বরের পাশে গিয়ে তাঁর কদমে নিজেদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহু তাঁদের প্রত্যেককে নিজের সিনার সাথে লাগালেন, তারপর তাদের প্রত্যেকে বললেন, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এই আর তার জবাব হচ্ছে এই।

যখন সভা সমাপ্ত হলো, আমি কতেক আলিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কি হলো? তাঁরা বললেন, যখন আমরা মজলিসে বসলাম, তখন মনে হয়েছিলো, আমরা ইলম থেকে একেবারে অজ্ঞ এবং যা কিছু শিখেছিলাম তা সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর সিনার সাথে লাগালেন তখন ইলমের রশ্মি ফেরৎ পেলাম। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি যা কিছু ইরশাদ করেছেন, ইতোপূর্বে এমন সুন্দর উত্তর আমরা শুনেনি।

ইরাকের বড় বড় শায়খ ও আলিম তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়া

শরীফ মুহাম্মদ ইবনে আযহার হুসাইনী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর মজলিসে ইরাকের প্রথম সারীর শায়খ-ই তরিকত ও আলিমগণ উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে, শায়খ বাকা[২৬], শায়খ

এককভাবে কোন পার্থিব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা ছাড়াই করেছিলেন। বর্তমান যুগে না'রাবাজরা সমাজ-সংস্কারের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে, তার প্রতি নিজেদের কার্যত কোন আমল পেশ করতে তারা ব্যার্থ। তারপরও ওই বে-আমল লোকেরা বলে থাকে, সূফীয়া-ই কিরাম সামাজ সংস্কারের প্রতি কোন মনোযোগ দেননি। এক লক্ষ অসৎ চরিত্রের মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করা এবং এ তাওবাকারী লোকেরা নিজ চারিত্রিক গুণে অন্যান্যদের জন্য আদর্শের নমুনায় পরিণত হওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

২৬. শায়খ বাকা ইবনে বতূ (রহঃ) বড় সাহেব-ই কামাল, কাশাফ সম্পন্ন ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যমের মজলিসে থেকে ফয়েজ (আধ্যাত্ম শিক্ষা) অর্জন করেন। তিনি শায়খ আবূল ওয়াফার মুরীদ ছিলেন। 'হযরত

Scanned by CamScanner

আলী ইবনে হায়তী, শায়খ আবুন নজীব সোহরাওয়ার্দি[২৭](রাহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি হুযূরের মজলিসে শায়খ আবদুর রহমান তাফসূনজীকে দেখেছি তিনি দীর্ঘক্ষণ সময় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতেন এবং বলতেন, আমি হযরত গাউসুল আযমের কালাম (বক্তব্য) শুনার জন্য নিরবতা পালন করি।

হযরত শায়খ 'আদী ইবনে মুসাফির[২৮] দূরদেশে অবস্থান কালে হযরত গাউসুল আযমের বক্তব্য শুনার জন্য উচ্চ স্থানে চলে যেতেন এবং নিজের অবস্থানের চারিদিকে একটি বৃত্তরেখা টেনে বলতেন, যারা হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর বক্তব্য শুনতে ইচ্ছুক, তারা যেন এ বৃত্তরেখার মধ্যে ঢুকে পড়েন। তাঁর অনুসারীগণ ওই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়তেন এবং হযরত গাউসুল আযমের মজলিসের পুরো বক্তব্য শ্রবণ করতেন। অনেকে তারিখসহ তাঁর বক্তব্য লিখে রাখতেন। যখন বাগদাদে গিয়ে অন্যান্যদের কপির সাথে মিলাতেন তাতে প্রতিটি শব্দ নির্ভুল দেখতেন। শায়খ আদী ইবনে মুসাফির যখন বৃত্ত তৈরী করতেন, তখন বাগদাদে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্য বলতেন, শায়খ আদীও আমাদের মজলিসে সামিল আছেন।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাতহ্ হারভী বর্ণনা করেন, একবার শায়খ আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর মজলিসে বক্তব্য শুনার আমার সৌভাগ্য হয়। এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় হালের মধ্যে বিভোর হয়ে বললেন, যদি আল্লাহ চাহে আমার বক্তব্য শুনার জন্য এক সবুজ পাখি প্রেরণ

গাউসুল আ'যমকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখেছিলেন। তিনি ৫৫৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন 'বাব-ই নূস' গ্রামে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

২৭. শায়খ আবুল নাজীব আবদুল কাহির-এর উপাধি ছিল যিয়া উদ্দীন। তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মিলিত হয়। তরীকতের সিলসিলা ইমাম গাযযালীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। সোহরাওয়ার্দি তরীকার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত গাউসুল আ'যমের শিক্ষা মজলিস থেকে বেশ উপকৃত হন। তিনি বড় লেখক ছিলেন। ১২ জুমাদাল আখির ৫৬৩ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদ তাঁর মাযার বিদ্যমান।

২৮. শায়খ 'আদী ইবনে মুসাফির শামী হানকারী (রহঃ) কারামত সম্পন্ন বুযর্গ ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যমের পীর-মুরশিদ শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস ও শায়খ 'আকীল সখী থেকে ফয়েয লাভ করেন। তিনি সিরিয়ায় আম-খাস সকলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মাওসিলে তার খানকা ছিল রূহায়ানীতের কেন্দ্র। সেখানে বসেই তিনি বাগাদাদে প্রদত্ত গাউসুল আ'যমের বক্তৃতা ও দরস শুনতেন। তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের হজ্জের প্রথম সফরে সফর সঙ্গী হন। কা'বা শরীফ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি ৫৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হানকারীর পাহাড়ে তাঁর মাযার বিদ্যমান।

করতে পারেন। এটা বলতেই একটি সুন্দর সবুজ রংয়ের পাখি তাঁর জামার আস্তিনে ঢুকে পড়লো, বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা' আর বের হলোনা।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, একদিন আমার হুযূরের বক্তব্য শুনার সুযোগ হয়। আমি দেখলাম, মজলিসের লোকদের মধ্যে কিছুটা শৈতল্যভাব দেখা দিলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ চাহে তো আমার মজলিসে অনেক সবুজ পাখি প্রেরণ করতে পারেন। একথা বলার দেরী অনেক সবুজ পাখি এসে হাজির, যেগুলোকে উপস্থিত সকলে দেখেছেন।

একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (কুদরত-ই কামিলা) এর উপর বক্তব্য রাখছিলেন। উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁর বক্তব্যের প্রভাব বিস্তার করছিলো। এমন সময় এক আজব ধরনের পাখি মজলিসের উপর দিয়ে উড়ে যায়। তখন কিছু লোক ওই দিকে মনোনিবেশ করলে তিনি ইরশাদ করলেন, মহান রবের ইয্যতের শপথ! যদি আমি ওই পাখির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতাম, তবে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মরে যেতো। এখনো তিনি ওই বাক্য শেষ করেননি, পাখিটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে মরে গেলো।

হুযূরের মজলিসে সাহেবজাদা সাইয়্যিদ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাবের বক্তব্য প্রদান

আবু সালিহ নুসর কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইবনে সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক বলেন, আমি আমার শ্রদ্ধেয় চাচা আবদুল ওয়াহ্হাবকে বলতে শুনেছি যে, আমি অনারব দেশে প্রত্যেক প্রকারের ইলম (বিদ্যা) শিখে যখন বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমার সম্মানিত পিতার নিকট তাঁর মজলিসে ওয়ায করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অনুমতি পেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে সুললিত বচনে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করতে লাগলাম। আমার পিতাও শুনছিলেন। আমার বক্তব্যে না কারো হৃদয় বিগলিত হলো, না কারো চোখে পানি আসলো। ফলে মজলিসের সবাই ঐক্যমত হয়ে আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে ওয়ায করতে অনুরোধ করলেন। তিনি মিম্বরে বসে বললেন, গতকাল আমি রোযা রেখেছিলাম। উম্মে ইয়াহইয়া আমার জন্য কয়েকটি ডিম রান্না করে একটি পাত্রে রাখলেন। একটি বিড়াল এসে ওই পাত্রটি ফেলে দিলো। ফলে ডিমগুলো মাটিতে পড়ে ধূলায় জড়িত হয়ে গেলো। তিনি এটুকু বলতে না বলতেই শ্রোতাদের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং সভাস্থলে আল্লাহ প্রেমিকদের হায়-হুতাশ ও কান্নার রোল পড়ে গেলো। যখন মজলিস

Scanned by CamScanner

শেষ হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ব্যাপার! তিনি বললেন, যখন আমি মিম্বরে গিয়ে বসি, তখন আল্লাহ আমার অন্তরে তাজ্জালি (জ্যোতি) প্রদান করেন এবং তাঁর দয়ার দৃষ্টি বেশী করে দেন। আমার উপর যে সব নূর ও তাজ্জালি প্রকাশিত হয় আমি তাই বর্ণনা করতে থাকি।

তিনি আরো বললেন, আমার রবের শপথ, আমি বলি না, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বলতে বলা হয় না। আমার প্রতি এ বলে নির্দেশ করা হয় যে, হে আবদুল কাদের! আমি তোমাকে কথা বলার ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছি, তুমি শুনাতে থাক, আমি স্বয়ং আল্লাহ শুনবো।

গাউসুল আযমের মজলিসে প্রিয় নবী নিজ সাহাবীসহ শুভাগমন করা

সাইয়্যিদ কবীর (যিনি শায়খ বাকা নামে প্রসিদ্ধ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর মজলিসে ওয়ায শুনছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি বক্তব্য দেওয়া বন্ধ করে মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন। তারপর মিম্বরের দ্বিতীয় সিঁড়িতে গিয়ে বসলেন। আমি দেখলাম যে, প্রথম সিঁড়ি এক দৃষ্টি পরিমাণ প্রশস্থ হয়ে গেলো, তাতে রেশমী বিছানা বিছানো আছে। প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে তশরীফ রাখলেন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত 'উসমান ও হযরত 'আলী (রাদিআল্লাহু আনহুম)ও হুযূরের সাথে বসে আছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের শায়খের প্রতি তাজ্জাল্লি করলেন। এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করলেন। তারপর দেখলাম, তাঁর শরীর ছোট হতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত চড়ুই পাখির মতো ছোট হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার বৃদ্ধি পেতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত তা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো। তারপর এ সব কিছু আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো। শায়খ বাকা থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের দর্শন লাভ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রূহসমূহ উনসরী আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তা'আলা যাকে এ পবিত্র শরীর দেখার শক্তিদান করেন, সে তা দেতে পারে। যেমন, মি'রাজ শরীফে হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর শরীর ছোট-বড় হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, প্রথম তাজাল্লি তো এমন ছিলো যে, তা প্রকাশ হওয়ার সময় কেউ স্থির থাকতে পারে

না, যদি না নবীর সাহায্য থাকে। যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য না করতেন তবে তিনি পড়ে যেতেন। দ্বিতীয়টি হলো জালালী তাজাল্লি। যার কারণে তিনি ছোট হয়ে যান। আর তৃতীয়টি ছিলো জামালী তাজাল্লি, যার কারণে তিনি বড় হয়ে যান। "ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِي لِمَنْ يَشَاءُ" এটা আল্লাহর দয়া, তিনি যাকে চান দান করেন।

পোশাক ও খিলআত

আবুল ফযল আহমদ ইবনে কাসিম ইবনে আবদান কুরায়শী বাগদাদী বয্যার বলেন, হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত মূল্যবান ও দামী কাপড় পরিধান করতেন। একদিন তাঁর খাদিম এসে আমাকে বললেন, আমাকে এমন কাপড় দিন, যার মূল্য প্রতি গজ একদিনারের যেন কম না হয়। আমি কাপড় দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, এতো দামী কাপড় কার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর নাম বললেন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এতো দামী কাপড় তো রাজা-বাদশাগণও পরিধান করেন না। আমার অন্তরে এ ভাবনা আসতেই আমার পায়ে কি যেন ঢুকে গেলো, যার প্রচন্ড ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ি। লোকেরা তা বের করতে বিফল হলো। আমি চিৎকার করে বললাম, আমাকে গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যান। যখন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি আমাকে দেখেই বললেন, অন্তরে মন্দ ধারণা কেন পোষণ কর। আল্লাহর শপথ, এ কাপড় পরিধান করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি বলেই তা পরিধান করি।

সাক্ষাৎকারীদের সম্পর্কে সুসংবাদ

হযরত আবু সালিহ বলেন, আমার পিতা সাইয়্যিদ তাজ উদ্দীন আবদুর রায্যাক এবং আমার চাচা সাইয়্যিদ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব (যিনি হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহির পুত্র) উভয়জন বলতেন, হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে সে সৌভাগ্যবান, যে আমাকে দেখেছে এমন লোককে দেখেছে সেও সৌভাগ্যবান। আর আমাকে দেখেছে এমন লোকের পরবর্তীজনকে দেখেছে সেও সৌভাগ্যবান। ওই ব্যক্তি কতই দুর্ভাগা যে আমাকে দেখেনি।

Scanned by CamScanner

হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ এবং গাউসুল আযম

আবুল কাসিম বায্যার বলেন, হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ[২৯] থেকে লাগযিশ বা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিলো। ওই যুগে তাঁকে রক্ষা করার মত কেউ ছিল না। যদি আমি ওই যুগে থাকতাম তবে অবশ্যই সাহায্য করতাম। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করতে থাকবো, যার হাত আমার কোন প্রিয় মুরীদের হাতে রেখেছে। তিনি আরো বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরো নৈকট্য দান করতেন, তবে আমি মহান রবের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতাম যে, তিনি যেন আমার প্রত্যেক মুরীদের তাওবা কবূল করেন।

হযরত গাউসুল আযমের খাদিমের আশ্চর্য ঘটনা

হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহু'র একজন খাদিমের একবার সত্তর বার স্বপ্নদোষ হয়। প্রতি বারই সে একেক জন নতুন মহিলার সাথে স্বপ্নে সহবাসে মিলিত হয়। সকালে সে এ স্বপ্নের কথা বলার ইচ্ছায় হুযূরের মজলিসে উপস্থিত হয়। ওই লোকটি বলার আগেই হুযূর বললেন, রাতের ঘটনায় ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি লাওহে মাহফূযে যখন দেখলাম, তোমার তাকদীরে সত্তর বার ব্যভিচার করার কথা লিখা রয়েছে তখন আমি আল্লাহর দরবারে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবূল করলেন- জাগ্রত অবস্থাকে নিদ্রা অবস্থায় পরিবর্তন করে দিলেন।

---

[২৯]. হযরত শায়খ হুসাইন ইবনে মাসনসূর হাল্লাজ-এর উপনাম (কুনিয়াত) হচ্ছে আবুল গায়স। তাঁর মাতৃভূমি পারস্যের 'বায়দা' এলাকায়। তাঁর মধ্যে সর্বদা 'জযব' বিদ্যমান থাকত। তাঁর বেলায়তের মর্যাদা ও মকাম সম্পর্কে তরীকতের শায়খদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তাঁর মুরশিদ শায়খ 'আমর ইবনে উসমান মক্কী আবূ ইয়াকুব আলী ইবনে সুহাইল ইস্পাহানী তাঁকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে যাদুকর বলে জানতেন। কিন্তু শায়খ শিবলী, আত্তার, শায়খ আবদুল্লাহ্ খাফীফ, শায়খ আবুল কাসেম নসীরাবাদী, শায়খ আবুল খায়র, শায়খুল উসলাম খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী, শায়খ আবুল কাসিম গারগানী, মাওলানা রুমী, শায়খ মাখদুম আলী হাজভিরী প্রমুখ তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর 'আনাল হক' উক্তির জন্য তাঁরা তাকে মাজযূব মনে করতেন। হযরত দাতা গঞ্জবখশ 'কাশফুল মাহজূব' এ লিখেছেন, 'আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করি। সে সাথে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, তাঁর উক্তিগুলো তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। হযরত খাজা ফারিসা (রহঃ) 'ফাসলুল খিতাব' এ লিখেছেন, হযরত জুনাইদ বাগদাদীকে হযরত মানসূর হাল্লাজের হত্যার ফাতোয়া দাতাদের মধ্যে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, হযরত জুনাইদ বাগদাদী তাঁর হত্যার নির্দেশের ১২ বছর পূর্বে ওফাত বরণ করেছেন। তাঁর প্রতি যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে তা তাঁর ইশকের জয্বাহ্ প্রকাশ করার ফলশ্রুতিই ছিল। তাকে বাগদাদের 'বাবুত তাক্' এ ২৫ জিলহাজ্জ ২০৯ হিজরী হত্যা করা হয়।

মাদ্রাসা-ই বাগদাদের দ্বার হচ্ছে রহমতের দ্বার

হযরত 'ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ কায়মাস বলেন, আমি হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার রব আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যে মুসলমান আমার মাদ্রাসার পাশ দিয়ে গমন করবে, তার কবরের আযাব হাল্কা করা হবে। একবার আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, ওই সময় একজন লোক তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, বাবুল ইযাজ' (মাদ্রাসা-এ কাদিরিয়া)-এর পাশে কিছুদিন আগে এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তার কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। তিনি বললেন, ওই লোক কী আমার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছে? লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করলো। তারপর তিনি বললেন, সে কি কোনদিন আমার মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলো? উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা দেখেনি। হুযূর বললেন, বড় দূর্ভাগা এবং সীমালংঘনকারী লোক ছিলো। কিছুক্ষণ পর হুযূর মুরাকাবায় (ধ্যানে) বসলেন এবং মুরাকাবা ভঙ্গ করে বললেন, আল্লাহর ফিরিশতাগণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওই ব্যক্তি জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমার সুপারিশের দ্বারা স্বীয় রহমত অবতীর্ণ করেছেন। এ ঘোষণার পর থেকে চিৎকারের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মুহাম্মদ সাইয়্যিদ আবদুল জাব্বার ইবনে শায়খ আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, যখন আমার মাতা কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর সামনে এক উজ্জ্বল বাতি প্রকাশ পেতো, যার কারণে ওই স্থান আলোকিত হয়ে পড়তো। একদিন আমার পিতা বাহির থেকে এসে ওই অবস্থা দেখতে পেলেন। এবং তাঁর দৃষ্টি ওই উজ্জ্বল বাতির উপর পড়তেই তা নিভে যায়। তখন তিনি আমার মাকে বললেন, যে আলো তুমি দেখতে, তা ছিলো শয়তান। যে তোমার খিদমত করতো। আমাকে দেখে সে পালিয়ে গেছে। এখন 'রহমানী নূর' তোমাকে পথ দেখাবে। আমার সাথে যার নিসবত আছে অথবা যার প্রতি আমার স্নেহের দৃষ্টি থাকবে- প্রত্যেককে আমি নূরে রাহমানীর বাতি দান করে থাকি।

আমার মাতা বলেন, ওই দিন থেকে যখনই আমি অন্ধকারে গমন করতাম, ওই অন্ধকার চাঁদের আলোতে দূরীভূত হয়ে যেতো।

Scanned by CamScanner

গাউসুল আযম থেকে সাহায্য প্রাপ্ত

শায়খ আবুল হাসান আলী খাব্বার বলেন, আমি শায়খ আবুল কাসিম উমর বায্যারকে বলতে শুনেছি যে, হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহু ইরশাদ করতেন, 'যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমার ওসীলা নিয়ে (আল্লাহর কাছে) প্রার্থনা করবে, তার বিপদ দূরীভূত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আহ্বান করবে, বিপদের ঝড় দূর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ নিয়মে দু'রাকাত নামায আদায় করবে, তার প্রত্যেক অভাব পূরণ হবে। [এ নামাযের নিয়ম হচ্ছে]- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা এখলাস পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পর ১১ বার হুযূর সরকার-ই কায়িনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পড়বে। তারপর ইরাকের দিকে মুখ করে ১১ কদম চলবে এবং আমার নাম নিয়ে আহ্বান করবে আর স্বীয় হাজতের কথা মনে মনে স্মরণ করবে। আল্লাহর হুকুম তার ওই অভাব পূরণ হয়ে যাবে।

কতেক বর্ণনা আছে, হুযুরের রচিত নিম্নোক্ত এ দু'টি শে'র পড়াও জরুরী।

أَيُدْرِكُنِي ضَيْمٌ وَأَنْتَ ذَخِيرَتِي   وَأَظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِيرِي
وَعَارٌ عَلَى حَامِي الْحِمَى وَهُوَ مُنْجِدِي   إِذَا ضَاعَ فِي الْبَيْدَاءِ عِقَالُ بَعِيرِي

'আমার উপর জুলম কী করে হতে পারে, যখন আপনি আমার রক্ষক? যখন আপনি আমার সাহায্যকারী, তবে পৃথিবীতে আমার উপর জুলম হবে কেন? চারণভূমির রক্ষকের জন্য ওই উটের হারিয়ে যাওয়া লজ্জার কারণ যে পথ ভুলে গেছে।'

শায়খ মানসূর ওয়াসিতীর বর্ণনা

শায়খ মানসূর ওয়াতিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, ওই সময় তিনি কি যেন লিখছিলেন। তখন ছাদ থেকে কাগজের উপর কিছু মাটি ঝড়ে পড়লো, হুযূর তা ঝেড়ে নিলেন। এভাবে তিনবার পড়লো, প্রতিবারই ঝেড়ে নিলেন। চতুর্থবার পড়লে ছাদের দিকে চোখ তোলে তাকালেন, দেখলেন একটি ইঁদুর মাটি ফেলছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর হুকুমে তোমার মাথা ছিন্ন হোক। এ কথা বলতেই ইঁদুরটির মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের এক পাশে গিয়ে পড়লো। তা' দেখে তিনি লেখা বন্ধ করে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আমি আরয করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি বললেন, আমি এ ভয় করছি যে, কোন মুসলমান কর্তৃক আমি কষ্ট পেলে, তার অবস্থাও যেন তেমনটি না হয়।'

তাঁর ওয়াজ-মাহফিলের প্রকৃতি

হযরত আবদুল লতীফ ইবনে আহমদ বলেন, একদিন হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহু বক্তৃতা করছিলেন, তখন শ্রোতার অমনোযোগিতা প্রকাশ পেলে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন,

لَا تَسْقِنِي وَحْدِي فَمَا عَوَّدْتَنِي   إِنِّي أَشُحُّ بِهَا عَلَى جُلَّاسِي
أَنْتَ الْكَرِيمُ وَهَلْ خَلِيقٌ تَكَرُّمًا   إِنِّي يَعْبُرُ اللهُ مَاءَ وَذَالِكَاسِ

'আমি একাকী মহব্বতের শুরা পান করতে চাই না এবং আমার সাথে উপবেশনকারীদের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব সৃষ্টি করো না। তুমি দয়াময়, তোমার দয়ার দাবী হচ্ছে- কোন উপবেশনকারী মহব্বতের এ শুরা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।'

এ কবিতা তিনি এমন দরদ ভরা কণ্ঠে পড়লেন যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে 'ওয়াজদ' (ভাবের) সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন শ্রোতা এ ভাব সহ্য করতে না পেরে ওই জায়গায় মারা যায়।

ইবনে সাকার ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আলী হাসরূন তামিমী শাফেয়ী বর্ণনা করেন, আমি জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদে আসলাম এবং নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই। ইবনে সাকা ছিলো আমার সহপাঠি। আমরা উভয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতাম এবং আল্লাহওয়ালা (ওলীয়ুল্লাহ) দের সাক্ষাতে বের হতাম। বাগদাদে একজন লোক 'যুগের গাউস' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি যখন লোকদের সম্মুখে প্রকাশ পেতে ইচ্ছা করতেন প্রকাশ পেতেন আর যখন গোপন হবার ইচ্ছা করতেন অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

আমরা একদিন তাঁর সাক্ষাতে গেলাম। পথিমধ্যে ইবনে সাকা বললো, আজকে আমি তাঁর নিকট এমন এক ইলমী মাসআলা জিজ্ঞাসা করবো, যার জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি বললাম, আমি একটি মাসআলা জানতে চাইবো, দেখি তিনি কী জবাব দেন। শায়খ আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু বললেন, 'আল্লাহর পানাহ! আমি তো তাঁর কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসাই করবো না, বরং তাঁর মজলিসে বসে তাঁর সান্নিধ্যের ফয়েযই অর্জন

Scanned by CamScanner

করবো। যখন আমরা তিনজন তাঁর আবাসস্থলে পৌছালাম, তখন দেখলাম তিনি সেখানে উপস্থিত নেই। কিছুক্ষণ পর তাঁকে ওই স্থানে বসা অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি ইবনে সাকার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় তাকালেন এবং রাগতস্বরে বললেন, ইবনে সাকা! আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুক। তুমি আমার কাছে এমন বিষয় জিজ্ঞেস করবে, যার উত্তর আমার জানা নেই। কান পেতে শুন। তোমার জিজ্ঞাসিতব্য বিষয় হচ্ছে এই। আর তা জবাব হচ্ছে এই। আমি দেখছি, কুফরের আগুন তোমার বক্ষকে প্রজ্জ্বলিত করছে। [অর্থাৎ তুমি কাফির হয়ে মরবে]

তারপর তিনি আমার প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন, আবদুল্লাহ! তুমি আমার কাছে এ জন্য মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে, যেন আমি কী জবাব দিই তা দেখবে। শুন! তোমার মাসআলা হচ্ছে এই, আর তার জবাব হচ্ছে এই। এ বে-আদবীর কারণে দুনিয়া তোমার দু'কান পর্যন্ত পৌছবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বারা দ্বীনের কোন উপকার হবে না, দুনিয়ার মায়ায় তুমি আটকা পড়বে।]

অতঃপর তিনি সাইয়্যিদ আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে নিজের কাছে বসালেন, অত্যন্ত সম্মান করলেন আর বললেন- আবদুল কাদের! তুমি আদবের কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করেছো। আমি দেখছি, অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে, যখন তুমি বাগদাদের মিম্বরে বসে বক্তৃতা দিতে থাকবে এবং ঘোষণা করবে,

قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ.

'আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর।' আমি এ-ও দেখছি যে, ওই সময়কার সমস্ত ওলী তোমার মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং নিজ নিজ গর্দানসমূহ তোমার সমীপে ঝুঁকিয়ে দেবে। এ কথা বলেই তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যান। তারপর তাকে আর দেখতে পেলাম না।

এ ঘটনার পর আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর নৈকট্য ধন্য হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো। সর্বসাধারণ তাঁর কাছে দলে দলে আসতে লাগলো। আমি তাঁর ওই ঘোষণা আমার জীবদ্দশায় শুনেছি। ওই সময়কার সমস্ত ওলী তাঁর ঘোষণায় নিজ নিজ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবনে সাকা শরয়ী জ্ঞানে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করলো যে, যুগের সকল ফকীহ ও আলিমগণ তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করে নিলো। সে

তর্কবিদ্যায় এমন পারদর্শী হয়ে উঠলো যে, তার বিরুদ্ধ দলকে মুহূর্তে পরাজিত করে ছাড়তো। এ ছাড়া সে অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মিতায় প্রসিদ্ধ লাভ করে। আব্বাসী খলীফা তাকে তার রাজকর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এবং রুম দেশে রাজদূত হিসেবে নিযুক্ত করেন। যেখানে সে শাহী দরবারে খ্রিষ্টান আলিমদেরকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে দেয়। এতে বাদশার কাছে তার সম্মান আরো বেড়ে যায়। একদিন রুমের বাদশার যুবতী রূপসী কন্যাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। বাদশার কাছে তাকে বিবাহ করতে আবেদন জানালো। বাদশা তাকে বললো, তুমি যদি খ্রিষ্টান হয়ে যাও তবে বিবাহতে আপত্তি নেই। সে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তখনই তার ওই গাউসের ভবিষ্যত বাণীর কথা স্মরণ আসলো। ওই গাউসের বদ-দোয়াই ছিলো তার এ অশুভ পরিণতির কারণ।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দামিস্কে চলে যায়। সেখানে শহীদ সুলতান নূরুদ্দীন[৩০] রাহমতুল্লাহি আলাইহি আমাকে আওকাফের প্রধান নির্বাহী নিযুক্ত করলেন আর দুনিয়া আমার দিকে ধেয়ে আসলো। আমি সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার কাজে নিমগ্ন হলাম।

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

শায়খগণের একটি দল বর্ণনা করেছেন যে, শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান তাফসূনজী রাহমতুল্লাহি আলাইহি একবার মিম্বরে বসে ওয়ায করার সময় বললেন, আমি মানুষের মধ্যে তেমনি উঁচু গর্দানের অধিকারী যেমন পাখিদের মধ্যে উট পাখি হয়ে থাকে। সুতরাং আমার যে মুরীদের বোঝা বেশী ভারী হবে তা আমি আমার গর্দানে নিয়ে নেবো। ওই মজলিসে এক হাল সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ হুসায়নী। তিনি নিজ খিরকা এক পার্শ্বে রেখে বললেন, আমি আপনার সাথে কুস্তি লড়তে চাই। শায়খ আবদুর রহমান তাঁর একথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং নিজ মুরীদদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি ওই লোকের প্রতিটি চুল পর্যন্ত আল্লাহর বদ্যানতায় পরিপূর্ণ দেখছি। তারপর তিনি উপদেশচ্ছলে

---

৩০. সুলতান নুরুদ্দীন শহীদ আতাবেক খান্দানের ওই বীর জেনারেল, যিনি ক্রুসেডের যুদ্ধে খ্রীষ্টানদের দোরগোড়ায় পৌছেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ওই খান্দানের সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আয়ুবী খ্রীষ্টানদের অত্যাচার-অবিচার ধুলায় মিশিয়ে দেন। নুরুদ্দীন জঙ্গী বড় মুত্তাকী ও বীর বাদশা ছিলেন। ১১৫৪ হিজরীতে নুরুদ্দীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন এবং মিসর ও সিরিয়া জয় করেন। তাঁর শাসনামলে মাওসল থেকে 'হাওরান' পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। 'মাসীরাহ' নামে তাঁর এক জেনারেলকে 'মিসর বিজয়ী' হিসেবে মনোনীত করেন। (তারিখ-ই ইসলাম)

Scanned by CamScanner

বললেন, আপনি খিরকা পরিধান করে নিন। ওই হালধারী ব্যক্তি বললেন, যা একবার ফেলে দিয়েছি, তা পুনরায় পরিধান করবো না। তারপর নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করে বললেন, ফাতিমা! অন্য কাপড় নাও তো। অথচ সে ওই জায়গা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলো, সে কাপড় নিয়ে তাঁকে দিলো এবং তিনি তা পরিধান করলেন।

শায়খ আবদুর রহমান তাঁকে তাঁর পীর-মুরশীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন, আমার পীর হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু। সে বললো, হযরত গাউসুল আযমের তো এ পৃথিবীতে বেশ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আমি আল্লাহর নৈকট্যের দরজায় সর্বদা থাকি, কই তাঁকে তো সেখানে আসতে-যেতে কখনো দেখলাম না। অথচ ওই দরজায় আমার ৪০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু ওই সময় বাগদাদে বসে তাঁদের এ আলাপ শুনছিলেন এবং স্বীয় মুরীদ 'আয়াদ, বাওয়াব, মুযাফ্ফর জামাল, আবদুল হক এবং উসমান সরীফীনীকে বললেন, 'তাফসূনজ' শহরে যাও এবং পথিমধ্যে শায়খের মুরীদের একটি দল আসতে দেখবে তাঁদেরকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে। শায়খ আবদুর রহমানকে গিয়ে আমার সালাম বলবে এবং এ-ও বলবে যে, আপনি এখনও দরজায় অবস্থান করছেন। দরজায় অবস্থানকারী ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে কীভাবে দেখতে পাবেন, যিনি (আল্লাহর) পরম সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। পরম সান্নিধ্যপ্রাপ্তকে দরজায় অবস্থানকারী ব্যক্তি দেখতে পান না। আমার অবস্থান হচ্ছে 'মাখদায়' এবং আমি 'বাবুস্ সির' (গোপন দরজা) দিয়ে প্রবেশ করি এবং ওই দরজা দিয়ে বের হই। তাই আপনি আমাকে আল্লাহর দরবারে যেতে- আসতে কী করে দেখতে পাবেন? আমার এ বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে ওই খিল'আত, যা আপনি অমুক দিন আল্লাহর দরবার থেকে পেয়েছিলেন। তা আমার মাধ্যমেই প্রেরণ করা হয়েছিলো। তা ছিলো 'খিলআত-ই রিযা'। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অমুক বুযর্গী অমুক দিনে যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছিলো, তা-ও আমার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিলো। ওই দিন যে সৌভাগ্য আপনি পেয়েছিলেন তা ছিলো বিজয়ের মকাম। 'দরকাতের মকামে' আপনাকে বার হাজার ওলীদের উপস্থিতে বেলায়তের পোশাক পরিধান করানো হয়েছিলো। ওই সবুজ রংয়ের পোশাকের মধ্যে সূরা ইহলাসের বোতাম ছিলো, এবং ওই বোতাম ছিলো আমার হাতের তৈরী।

গাউসুল আযমের ওই প্রতিনিধি দল পথিমধ্যে ওই কাফেলার সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁদেরকে নিয়ে শায়খ আবদুর রহমানের কাছে গেলেন। আর শায়খ আবদুর রহমানকে হযরত আবদুল কাদের জিলানীর উপরোক্ত পয়গাম পৌঁছালেন। তিনি সব শুনে বললেন, হযরত আবদুল কাদের জিলানী সত্যবাদী, তিনি যুগের সমস্ত ওলীদের সুলতান এবং প্রভাববিস্তারকারী ওলী।

শায়খ আলী হায়তী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, একদিন আমি হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহির সাক্ষাতের জন্য বাগদাদে গেলাম। দেখলাম তিনি মাদ্‌রাসায় ছাদে ফজরের নামায আদায় করছেন। আমি যখন মরুভূমির দিকে তাকালাম, দেখলাম সেখানে 'রিজালুল গায়ব' এর ৪০টি কাতার দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিটি কাতারে ৪০জন লোক রয়েছে। আমি তাঁদেরকে বললাম, আপনরা বসছেন না কেন? তাঁরা বললেন, হযরত গাউসুল আযম নামায শেষে যতক্ষণ আমাদেরকে বসতে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমরা বসতে পারি না। কেননা, তাঁর কদম আমাদের গর্দানে রয়েছে। যখন তিনি নামায সম্পন্ন করলেন, তখন রিজালুল গায়বগণ তাঁর কাছে আসলেন এবং হাতবুসি ও সালাম করে করে চলে গেলেন।

একদিন শায়খ সাদকা বাগদাদী[৩১] রাহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত গাউসুল আযম মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানীর মুসাফিরখানায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, শত শত শায়খ ও আলিমগণ তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। যখন হযরত আবদুল কাদের মিম্বরে গিয়ে বসলেন তখনও তিনি চুপ করে আছেন, কারীকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে নির্দেশও দেননি, তবু তাঁর এ নিরবতায় লোকদের মধ্যে ওয়াজদের ভাব সৃষ্টি হলো। শায়খ সাদ্‌কা মনে মনে ভাবলো, তিনি না বক্তৃতা শুরু করলেন এবং না কারী কিছু পড়লেন, তারপরও এ ওয়াজ্‌দ কেন? তিনি আমার মনের এ অবস্থা জানতে পারলেন এবং বললেন, আমার এক ভাই বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে এক কদমে এখানে এসে পৌঁছালো এবং আমার হাতে তাওবা করলো। শায়খ সাদ্‌কা আবার মনে মনে ভাবলো, যে ব্যক্তি এক কদমে বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে বাগদাদে পৌঁছাতে পারে তাঁর আবার তাওবার প্রয়োজন কিসে? তিনি এবার ইরশাদ করলেন, তাওবা এ জন্য যে, ভবিষ্যতে সে বাতাসে উড্ডীয়ন করবে না। সে এখন আল্লাহর ভালবাসার পথ পাবার

[৩১]. তাঁর কুনিয়াত আবূল ফারাহ্ পিতার নাম শরীফ হুসাইন। তিনি বাগদাদের বাসিন্দা। হযরত গাউসুল আযমের শিক্ষা মজলিস থেকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ৫৭৩ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।

Scanned by CamScanner

শিক্ষা করছেন। তারপর তিনি বললেন- 'আমার তরবারি প্রসিদ্ধ। আমার কামানে সর্বদা তীর সংযুক্ত আছে। আমার তীরের নিশানা কখনো দিকভ্রষ্ট হয় না। আমার বর্ম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সোজা। আমার ঘোড়া সর্বদা প্রস্তুত। আমি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। আমি হালসমূহ লুপে নিই। আমি এক কুল-কিনারা হীন সাগর। সাবধান! সাবধান!! (নিজেকে রক্ষা কর।)

হে সারা বছর রোযা পালনকারী! হে জেগে ইবাদতকারী, হে পাহাড়ের অধিবাসী! জেনে রাখ, তোমাদের পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে। হে গির্জাবাসী! তোমাদের গির্জা ধ্বংস করে দেয়া হবে। আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা অবনত কর। আমি আল্লাহর এক নির্দেশ হই। হে পথিক! হে বীর! হে আবদালগণ! হে ছেলেরা! আস! আর এমন সমুদ্র থেকে ফয়েয অর্জন কর- যার কোন তীর নেই।

আমাকে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিয়েছেন, হে আবদুল কাদের! আমি তোমার কথা শ্রবণ করি। তুমি আমার নিজ সত্তার শপথ কর এবং আহার কর! আমার সত্যের শপথ, পান কর। আমার মহত্ত্বের শপথ, কথা বল। আমি তোমাকে প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছি।

যখন সূর্য উদিত হয়, তখন এটা আমাকে ঝুঁকে সালাম করে। সারা দিনের বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী আমাকে অবগত করান। সকাল বেলা আমাকে সালাম করে এবং নিজ ঘটিতব্য ঘটনাবলীর খবর প্রদান করে। আমার রবের সম্মানের শপথ, নেককার ও বদকার সবাইকে আমার কাছে পেশ করা হয় আর আমার দৃষ্টি থাকে লাওহে মাহফুযের উপর। আমি আল্লাহর ইলম ও মা'রিফাতের সমুদ্রের ডুবুরী। তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ প্রেমের মাধ্যম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতিনিধি, পৃথিবীতে তাঁর উত্তরাধিকারী। মানব-দানব সকলের পীর-মুরশিদ রয়েছে আর আমি হলাম 'শায়খুল কুল' বা সকলের পীর।

শায়খ আলী হায়তী বলেন, আমি একবার আমাদের সরদার হযরত আবদুল কাদের রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে হযরত মারূফ কারখী[৩২]

[৩২]. তাঁর উপনাম আবূ মাহফুয, প্রকৃত নাম 'মারূফ'। পিতার নাম ফীরূয বা ফারযা। প্রাথমিক জীবনে পৈত্রিক ধর্ম মতে অগ্নি উপসক ছিলেন। ইমাম আলী ইবনে মূসা রিযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মাযহাবগত 'হানাফী' ছিলেন। তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন ইমাম আলী রিযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সম্পর্কের কারণেই অর্জন করেছেন। ইমাম আলী রিযা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর পাহারাদারের সৌভাগ্য তাঁর ভাগ্যে জুটে ছিলো। জাহিরী ইলম ইমাম আযমের ছাত্র হযরত দাউদ তাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে অর্জন করেন। হযরত সালমান ফারসীর মুরীদ হযরত হাবীব রা'ঈ-এর প্রতি

রাহমতুল্লাহি আলাইহির কবর শরীফ যিয়ারত করি। তখন তিনি বললেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া শায়খু মারূফ! আপনি (শায়খ মারূফ) আমার চেয়ে এক স্তর উর্ধ্বে মর্যাদার অধিকারী। কিছুকাল পর আমরা আবার যিয়ারত করতে গেলাম। তখন তিনি বললেন, হে শায়খ মারূফ! আপনার প্রতি আমার সালাম। আমি আপনার চেয়ে দু'স্তরে উর্ধ্বে মর্যাদার অধিকারী। হযরত মারূফ কারখীর কবর থেকে আওয়াজ আসলো, ওয়া আলাইকাস সালাম ইয়া সাইয়্যিদা আহলিস যামান!

এ কিতাবে আমি ৪০টি বরকতময় ঘটনা, যা তাঁর কামালাত ও কারামতের দলীল বিশেষ লিখেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম ও বরকতসমূহ দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করুন। অনেক শায়খ অবিচ্ছিন্ন সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক হালধারী ব্যক্তি যে- কোন যুগে হযরত গাউসুল আযমের কারামত দেখার ইচ্ছা করতেন- তা দেখতে পেতেন। তাঁর কারামতের দ্বার আহলে কাশফের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

হযরত গাউসুল আযমের দু'সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুর রায্‌যাক ও সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহ্‌হাব উভয়ে এ বর্ণনায় একমত যে, তাঁরা বলেন, শায়খ বাক্কা একদিন শুক্রবার খুব ভোরে আমাদের সম্মানিত পিতার মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হলো আর বললো, আপনি জানেন কি আমি খুব ভোরে কেন এসেছি? তারপর নিজেই বলতে লাগলেন, গত রাতে আমার নূরের এক ঝর্ণাধারা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যখন আমি ভাবলাম এটা কি জিনিষ, তখন আমি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহির ব্যক্তিত্ব দেখালেন। তাই আমি এ ইচ্ছা নিয়ে এসেছি যে, ওই ঘটনার প্রকৃত রহস্য জানবো। এখন আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ নূর ছিলো তাঁর শুহূদের নূর। যা তাঁর কলবের নূরের সাথে মিলে বিশ্বজগতের জন্য আলোর কারণ হয়েছে। আমি সচক্ষে দেখেছি যে, এমন কোন ফিরিশতা ছিল না, যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি এবং তাঁর সাথে মুসাফাহা করেন নি। ফিরিশতাদের পরিভাষায় ওই অবস্থার নাম হচ্ছে 'শাহিদ' ও 'শুহূদ'।

তিনি শ্রদ্ধা রাখতেন। হযরত দাতাগঞ্জ বখশ আলী হাজভীরি 'কাশফুল মাহযুব' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত মারূফ কারখীর মর্যাদা ও ফযিলতের কোন সীমা ও হিসাব নেই। দ্বীনি শিক্ষায় তিনি তাঁর সমগোত্রীয়দের সরদার ছিলেন। ২রা মুহররম ২০০ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। বাগদাদে তাঁর মাযার সাধারণ ও বিশেষ সকল লোকের সমাবেশ স্থল।

Scanned by CamScanner

কবিতাবলী

একদিন সাহেবজাদাগণ হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 'সালাতুর রাগাইব' আদায় করেছেন। তখন তিনি এ কবিতাগুলো পাঠ করলেন-

إِذَا نَظَـرْتُ عَيْنِـي وَجُـوهُ جَنَـائِي   فَتِلْـكَ صَـلاَتِي فِى لَيَـاتِي الرَّغَائِـبِ
وَجُـوْهٌ إِذَا مَـا سَـفَرْتُ عَـنْ جَمَالِهَـا   أَضَاءَتْ لَهَا الأَكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِـبِ
حُرِمَـتِ الرِّضَـاءُ اَمْ لَمْ أَكُـنْ بَـاذِلاًّدِي   إِذَا حَمَّ شَجْعَانُ الْوَغَي بِالْمَفَاكِـبِ
أَشُقُّ صُـفُوْفَ الْعَـارِفِيْنَ بِعَزْمَتِـهِ   فَتَعْلُوْا لِمَجْدِي فَوْقَ تِلْـكَ الْمَرَاتِـبِ
وَمَنْ لَمْ يُوْنَ الْحُبَّ مَـا يَسْتَحِقَّهُ   فَذَاكَ الَّذِيْ لَمْ يَأْتِ قَطًّا بِوَاجِـبِ

'যখন আমার দৃষ্টি বন্ধুদের সমুজ্জ্বল চেহারাকে দেখে, এটা হচ্ছে সালাতুর রাগাইব। ওই চেহারাসমূহের জ্যোতিতে বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণু উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'রেযার মকাম' আমার জন্য হারাম যদি আমি ওই সব বীর, যারা জিহাদের ময়দানে নিজেদের বীরত্ব দেখাচ্ছেন, তাদের কাতার ছিড়ে প্রথম কাতারে গিয়ে না পৌছি। আমি তরীকতের দুনিয়ায় নিজ দৃঢ় ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে খোদার আরিফ বান্দাদের কাতার ছিড়ে অগ্রগামী হয়ে যায়। আর আমার জীবনের মহত্ব পেয়ে যায়। যে ব্যক্তি মহব্বতের হকসমূহ পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে সে জীবনের কর্তব্যাদিও পূরণ করতে পারে না।'

শরীফ আবু আবদুল্লাহ হুসাইন বাগদাদী বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহুর মজলিসে উপস্থিত হই। ওই দিন তাঁর মজলিসে দশ হাজার লোক শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলো। শায়খ আলী ইবনে হায়তী তাঁর সামনে বসা ছিলেন। তখন তাঁর কিছুটা তন্দ্রার ভাব আসলো। হযরত গাউসুল আযম তা দেখে লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা চুপ হয়ে যায়। লোকেরা এমনভাবে চুপ হয়ে গেলো যে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু শুনা গেলো না। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে শায়খ আলী হায়তীর সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং গভীর মনোযোগে তাঁকে দেখলেন। যখন শায়খ আলী হায়তীর তন্দ্রার ভাব কেটে যায় তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমার আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এ জন্যই আমি আদব সহকারে দাঁড়িয়ে

থেকেছি। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি ইরশাদ করেছেন? বললেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার খিদমতে থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

শায়খ আলী হায়তীকে লোকেরা 'এ কারণে আমি আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থেকেছি' (مِنْ اَجَلْهٗ تَاْدَيْـتُ)- এর অর্থ জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন, আমি হুযূরকে স্বপ্নের অবস্থায় দেখেছি আর হযরত গাউসুল আযম দেখেছেন জাগ্রত অবস্থায়।

একবার হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো যে, বেলায়তের প্রারম্ভ ও শেষ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি এ কবিতাগুলো আবৃতি করলেন–

أَنَـا رَاغِـبٌ فِى مَـنْ يَقْـرَبُ نَفْـسُهُ   وَمُنَاسِـب لِغَـسَتِيْ تَلاَطَـفَ لُطْفُهُ
وَمُفَـارِضُ الْعُـشَّاقِ فِى أَسْرَاهِـمِ   مِـنْ كُـلِّ مَعْنَـي لَمْ يَـسْعَنِي كَـشْفُهُ
قَـدْ كَـانَ يَـسْكُرُ فِى مِـزَاجِ شَرَابِـهِ   وَالْيَـوُمَ يُـضْحَنِي لَدَيْـهِ صَرْفُـهُ
وَأَغِيْـبُ عَـنْ رُشْـدِيْ بَـأَدَّلِ نَظْـرَةِ   وَالْيَــوْمَ أَمْتَجْلِيْــهِ ثُـــمَّ أَزِقْـــهُ

'আমার কাছে ওই ব্যক্তি বড় সম্মানিত, যে নিজেকে নিজে চিনেছে। এবং ওই যুবক ও (সম্মানিত) যে দয়া ও সম্মানকে নিজের অবস্থার অনুরূপ করে নিয়েছে। আমার কাছে আশিকগণের এমন সব রহস্য লুকায়িত রয়েছে, যা আমি প্রকাশ করতে পারি না। এক সময় মারিফতের শুরার সুঘ্রাণই আমাকে বেহুশ করে দিতো। কিন্তু এখন ওই অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে, মারিফতের বিশুদ্ধ শুরাও কোন প্রভাবিত করতে পারে না। এক সময় এমন ছিল যে, বন্ধুর একটি মাত্র দৃষ্টি আমাকে বিভোর করে ছাড়তো কিন্তু এখন আমি তাকে সর্বদা দেখি এবং সর্বদা তাঁর সাথে থাকি।'

তাজুল 'আরিফীন আবুল ওয়াফার সাথে সাক্ষাৎ

শায়খ আলী হায়তী বলেন, একদিন তাজুল 'আরিফীন আবুল ওয়াফা বাগদাদের মিম্বরে বসে বক্তৃতা করছিলেন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন যুবক। বাগদাদে তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না। তাজুল 'আরিফীন বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করে শ্রোতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তাঁকে মজলিস থেকে বের করে দেয়ার জন্য। লোকেরা তাঁকে বের করে দিলেন। তিনি পুনরায় বক্তৃতা দেয়া শুরু

Scanned by CamScanner

করলেন। হযরত আবদুল কাদের দ্বিতীয়বার যখন মজলিসে প্রবেশ করলেন তখন তাজুল আরিফীন মিম্বর থেকে নেমে এসে তাঁর সাথে গলাগলি করলেন এবং কপালে চুমা দিলেন আর বললেন, হে বাগদাদবাসী! এ আল্লাহর ওলীর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তাঁকে আমার মজলিস থেকে বের করার নির্দেশ তাঁকে অসম্মান করার জন্য দেয়নি বরং তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা আপনাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য দিয়েছিলাম। আমি আমার আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি তাঁর সিনা থেকে এমন নূরের রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখছি- যা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আলোকিত করছে।

তিনি আরো বললেন, হে আবদুল কাদের! এ সময় আমার, অতিসত্তর তোমার সময় আসছে। হে আবদুল কাদের! বাইরের কিছির মিসির শব্দকারী পাখিগুলো কিছুদিন পর নিশ্চুপ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার পাখি কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ ও মারিফতের জয়গান গেয়ে চলবে। তারপর তাজুল 'আরিফীন নিজ মুসল্লা, তাসবীহ, পানপাত্র ও লাঠি তাঁকে প্রদান করলেন। লোকেরা বললো, আপনি তাঁকে বায়আত করান। তিনি বললেন, তাঁর কপালে মাখযূমীর[৩৩] দাগ দেখতে পাচ্ছি। [অর্থাৎ শায়খ আবু 'সাঈদ মাখযূমী তাঁকে খিলাফতের খিরকা প্রদান করবেন]

বর্ণনাকারী বলেন, যখন মজলিস শেষ হলো তখন তাজুল 'আরিফীন মিম্বর থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং হযরত আবদুল কাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আবদুল কাদের। তোমার একটি সময় আসবে, ওই সময় আমার বৃদ্ধাবস্থার স্মরণ করবে। তিনি তখন নিজ শুভ্র দাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন।

শায়খ ওমর বায্যায্ রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি দেখেছি, যে তাসবীহ তাজুল 'আরিফীন তাঁকে দিয়েছিলেন, যখন তিনি ওই তাসবীহ মাটিতে রাখতেন তা ঘুরতো। যখন তিনি ওফাত বরণ করেন এ তাসবীহ তাঁর জামার ভেতর থেকে বের হয়। [অর্থাৎ সারা জীবন ওই তাসবীহ তাঁর সাথে ছিলো।]

---

৩৩. হযরত শায়খ আবূ সা'ঈদ মুবারক ইবনে 'আলী ইবনে হুসাইন আল-মাখযুমী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি ছিলেন আরিফগণের বাদশা, সূফীগণের ইমাম, সালিকগণের কিবলা, তরীকতের শায়খ, গোপন ও ব্যক্ত রহস্যের ধারক, জাহিরী ও বাতিনী ইলমে পরিপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। হযরত খাযির আলাহিস্ সালামের একান্ত বন্ধু ও হাম্বলী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। হযরত আবূল হাসান হানকারীর মুরীদ। তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের পীর-মুরশিদ ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের দরুন হযরত গাউসুল আ'যম বেলায়তের মকামসমূহ অর্জন করেন। 'মাদ্রাসা-এ বাবুল ইয়াজ'- যেখানে হযরত গাউসুল আ'যম রূহানী শিক্ষা দিতেন, তা তাঁরই হাতে গড়া। তিনি ৫১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (সফীনাতুল আওলিয়া)

তারপর ওই তাসবীহ শায়খ আলী হায়তী গ্রহণ করেন। তারপর শায়খ মুহাম্মদ ইবনে কায়িদ[৩৪] তা লাভ করেন।

কতেক বর্ণনার রয়েছে যে, হযরত তাজুল 'আরিফীন আবুল ওয়াফার চল্লিশজন খাদিম ছিলো, যারা সকলেই 'সাহিব-ই হাল' বুযর্গ ছিলেন।

হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, শায়খ আবুল ওয়াফা আল্লাহ তা'আলার যে নৈকট্য অর্জন করেছেন, কাররুবীন ফিরিশতাদের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। ইরাকে সর্বপ্রথম তিনিই 'আবুল ওয়াফা' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শায়খ-ই কবীর ইউসুফ ইবনে আইয়ুব হামদানী[৩৫] রাহমতুল্লাহি আলাইহি যখন বাগদাদে আসলেন, তখন তিনি 'যুগের কুতুব' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একটি সরাইখানায় অবস্থান করেন। তাঁর সাক্ষাতের জন্য হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহি আসলেন। তিনি তাঁকে আসতে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে বসালেন। এবং নিজেই তাঁর অবস্থাদি বর্ণনা করে নিজের সমস্যার সমাধান করতেন। হযরত আবদুল কাদের ওই সময় যুবক ছিলেন। হযরত শায়খ-ই কবীর তাঁকে ওয়ায করতে বললেন। তিনি বললেন, হযরত, আমি একজন অনারবীয় লোক, বাগদাদের বাগ্মি লোকদের সামনে আলোচনা করা আমার দ্বারা কি শোভা পায়। শায়খ-ই কবীর বললেন, আপনি তো ফিক্হ, উসূল, নাহু, তাফসীর ও হাদীস খুব ভালভাবে পড়েছেন। আপনি অবশ্যই আলোচনা করতে পারেন। মিম্বরে গিয়ে বসুন এবং বক্তৃতা শুরু করুন। কেননা, আমি আপনার শরীর থেকে এমন সুঘ্রাণ পাচ্ছি, যা অতিসত্তর শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এক প্রকান্ড গাছে পরিণত হবে।

হযরত শায়খ ইউসুফ রাহমতুল্লাহি আলাইহি আহলে হাকীকতের আদলে বড় হিকমতপূর্ণ ভাষায় আলোচনা করতেন। তিনি বলেন, সেমা হচ্ছে আল্লাহ

---

৩৪. হযরত শায়খ মুহাম্মদ আ-ওয়ানী (যিনি ইবনুল কায়িদ নামে প্রসিদ্ধ)। হযরত গাউসুল আ'যমের মর্যাদাবান মুরীদদের মধ্যে অন্যতম। তিনি 'কাশফ' ও 'শুহুদ'-এর অধিকারী ছিলেন। 'ফতূহাত' গ্রন্থে আছে, হযরত গাউসুল আ'যম তাঁকে 'মুরীদুল হযরত' উপাধিকে ভূষিত করেছেন। তিনি তাঁর পুরো জীবন হযরত গাউসুল আযমের খিদমতে উৎসর্গ করে দেন। সফীনাতুল আওলিয়া।

৩৫. হযরত খাজা ইউসুফ ইবনে আইয়ুব হামদানী প্রথম সারির সূফীদের একজন। তাঁর পূর্ব পুরুষ হামদানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শায়খ আবূ আলী ফারসিদীর মুরীদ ছিলেন। শায়খ আবূ ইসহাক শিরাযী থেকেও রূহানী ফয়েয অর্জন করেন। শায়খ আবদুল্লাহ্ সূফী ও শায়খ হাসান হামদানীর সহপাঠি ছিলেন। মাযহাবগত হানাফী ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যমের প্রতি মহব্বত পোষণ করতেন। তাঁকে খাজাদের ইমাম বলা হত। তাঁর জন্ম ৪৪৫ হিজরীতে এবং ওফাত ৫৩৫ হিজরীতে 'মর্'তে তাঁর মাযার অবস্থিত। খাজা আবদুল্লাহ্ বরকী, খাজা হাসান আনদাকী, খাজা আহমদ সী-ওয়ালী ও খাজা আবদুল খালিক 'আজদুওয়ানী প্রমুখ তাঁর মুরীদ ছিলেন।

Scanned by CamScanner

তা'আলার রাসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ দূত। অদৃশ্যের মণিমুক্তা ও উপকারী বিষয়। আধ্যাত্মিক বিজয়ের প্রারম্ভ এবং উপকারিতা তা দ্বারা অর্জন হয়। রূহের জন্য খাদ্যবিশেষ এবং শরীরের জন্য ঔষধ বিশেষ। একদল এটাকে আল্লাহ নিয়ামত জেনে শুনেন এবং অন্যদল এটাকে কুদরতের গুণ জেনে শ্রবণ করেন। সেমা তার উপযুক্ত শ্রোতার জন্য শুনার অধিকার আছে। এটা পর্দাসমূহ দূরীভূত করে, রহস্যগুলোকে উন্মোচন করে। এটা এমন এক বিজলি যার মধ্যে আলো রয়েছে, এমন এক সূর্য যা উদিত হবার সমস্ত সৌন্দর্য বিদ্যমান রয়েছে। রূহ, কলব সেমা দ্বারা রক্ষিত থাকে। আর যখন নাফস ও দেহ উপস্থিত থাকে না তখন চিন্তা ও ধ্যানের আকৃতি ধারণ করে। আহলে দিল বাতাসের শীর শীর শব্দে, বিন্দুর নড়াচড়ায়, গাছের মড়মড় শব্দে, প্রত্যেক বাগশক্তির অধিকারীর বচনেও সেমার স্বাদ অনুভব করেন।

শায়খ ইউসুফ হামদানী একদিন ওয়াজ করছিলেন, ওই সময় তাঁর মজলিসে একজন ফকীহও ছিলেন, সে তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে বললেন, চুপ কর, তুমি বিবেকহীন। তিনি বললেন, চুপ, আল্লাহ তোমাকে জীবিত না রাখুক। এটা বলার দেরী নেই, ওই ফকীহ মজলিসেই মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়্যিদ আহমদ কবীর রিফা'ঈ[৩৬] রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর ডান হাতে শরীয়ত আর বাম হাতে হাকীকত। যেখান থেকে চাও অঞ্জলি ভরে নাও। আমাদের যুগে হযরত আবদুল কাদের এর কোন দ্বিতীয় নেই।

কাকে 'কুতুব' বলা হয়

আবু রেযা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদী (যিনি মুফীদ নামে প্রসিদ্ধ) বলেন, অনেকদিন যাবৎ আমার অভিপ্রায় ছিলো, আমি এমন কামিল ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবো, যার থেকে 'কুতুব'-এর গুণাবলী ও চিহ্নসমূহ জেনে নিতে পারি। একদিন শায়খ আবুল জলীল আহমদ ইবনে সা'ইদ ইবনে ওয়াহ্হাব মুকরী বাগদাদী ইসাফা জামে মসজিদে আসলেন। ওই সময় সেখানে শায়খ আবু সা'ঈদ

[৩৬]. হযরত সাইয়্যিদ কবীর শায়খ সাইয়্যিদ আহমদ ইবনে আবুল হাসান আর-রিফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মুসা কাযিম-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর তরীকতের সিলসিলাহ্ পঞ্চম স্তরে উর্দ্ধে গিয়ে হযরত শায়খ শিবলীর সাথে মিলিত হয়। তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর প্রশংসাকারী ও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধ পোষণ করতেন। হযরত 'উবাইদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে 'বাত্ব' (بطائح) নামক স্থানে বসবাস করতেন। শাফিঈ মাযহাবভুক্ত ছিলেন। তাঁর মজলিসে 'রিজালুল গায়ব' উপস্থিত থাকতেন। তিনি বড় মর্যাদসম্পন্ন ও কামালাতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। ৫৭৮ হিজরীর জুমাদাল আওয়াল বৃহস্পতিবার 'সেমা' শুনা অবস্থায় ওফাত বরণ করেন। 'উবাইদা' গ্রামে 'বাত্ব্বা' নামক স্থানে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। (সফীনাতুল আওলিয়া' দারাশেকূ)

কায়লূভী[৩৭], শায়খ আলী হায়তীও উপস্থিত ছিলেন। আমি শায়খ আবু সা'ঈদ কায়লূভীকে 'কুতুব' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, 'কুতুব' ওই ব্যক্তি, যার দ্বারা যুগের বিলায়েত সমাপ্ত হয়। বেলায়তের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। সমগ্র বিশ্বজগতের রূহানী শৃঙ্খলা ও পরিচালনা তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বর্তমান যুগের 'কুতুব' কে? তিনি বললেন, হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমতুল্লাহি আলাইহি। এ কথা শুনা মাত্রই আমি ওই মজলিস থেকে উঠে হযরত আবদুল কাদের রাহমতুল্লাহি আলাইহির খিদমতে সবার আগে পৌছালাম। আমার ইচ্ছা ছিলো, এখন এ বিষয়ে তাঁর থেকে কিছু শুনি। যখন আমি তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি বক্তৃতা করছিলেন। আমি মজলিসে বসে পড়লাম। তিনি বক্তৃতার পরিসমাপ্তিতে বললেন, 'কুতুব'-এর পরিচয় আলোচনার উর্ধ্বে। কুতুব ওই ব্যক্তি, যার জন্য হাকীকতের প্রতিটি পথ-প্রান্তর উন্মুক্ত। বেলায়তের প্রতিটি স্তরের অধিকারী। যিনি 'ইনায়তের প্রতিটি মকামে দৃঢ়ভাবে পা রাখেন। যার মুশাহিদার প্রতিটি পথ সুপ্রশস্ত। যিনি হুযূরীর প্রতিটি মকামে ভ্রমণ করেন এবং মালাক ও মালাকূত জগতের প্রতিটি বিষয়ের উপর যার দৃষ্টি রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের প্রতিটি রহস্য যার দৃষ্টিতে থাকে। অস্থিত্বের প্রতিটি প্রকাশস্থলে যিনি শরীক থাকেন। আল্লাহর প্রতিটি কর্মে বাতিনী সম্পর্ক রাখেন। প্রতিটি নূর যার করায়াত্বে এবং প্রতিটি মারিফাত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যিনি শা'ইকীনদের প্রতিটি ইচ্ছার শেষ সীমানায় পৌছেছেন। ওয়াসিলীন-এর শেষ মানযিলের পরিণামের যিনি মালিক। প্রত্যেক বুযর্গী যিনি অর্জন করেছেন। প্রতিটি স্তর (মর্যাদা) যার পায়ের নীচে। যিনি সম্মানের পতাকাধারী। কুদ্রতের তরবারীর মালিক, বেসাল সৈন্যদলের সেনাপতি। বিশ্বে ওলী বানাতে এবং ওলীর পদ থেকে বহিস্কার করার ক্ষমাপ্রাপ্ত। যার সাথীগণ কখনো দূর্ভাগা হয় না। তাঁর প্রেমিকগণ তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে থাকে না। তাঁর মর্যাদার চেয়ে অন্য কারো মর্যাদা হতে পারে না। তাঁর উদ্দেশ্যের চেয়ে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারো অস্থিত্ব তাঁর অস্থিত্বের চেয়ে পরিপূর্ণ হতে পারে না। কারো 'শুহূদ' তাঁর শুহূদের চেয়ে উজ্জ্বল হতে পারে না। তাঁর চেয়ে বেশী কেউ শরীয়তের অনুসরণ করতে পারে না। তিনি কায়িন (كـائن) ও

[৩৭]. হযরত শায়খ আবূ সা'ঈদ কায়লূবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সায়্যিদ বংশীয় এবং ইরাকের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযর্গ ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যম'র কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। তিনি ৫৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 'কায়লুভী'তে তাঁর মাযার শরীফ বিদ্যমান। (সফীনাতুল আওলিয়া- কৃত দারাশেকূ)

Scanned by CamScanner

এবং বায়িন (بـَـائِن)ও। তিনি সংযুক্তও এবং বিচ্ছিন্নও। তিনি পৃথিবাসীও এবং আসমানবাসীও। তিনি কুদসীও এবং গায়বীও। তিনি ওয়াসিতা-ও এবং খালিসাও। তিনি উপকার সাধনকারী। পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই দৃষ্টির শেষ বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। তাঁর একটি বিশেষ গুণ রয়েছে, তিনি তাতে সীমাবদ্ধ থাকেন। তিনি শরীয়তের বিধানের অনুবর্তী (মুকাল্লিফ) হয়ে থাকেন।' পরিশেষে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাগুলো বড় আবেগ আপ্লুত ভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন–

مَـا فِيْ الـصَّبَابَةِ مُنْهِـلٌ مُـسْتَعْذَبٌ ۝ اِلاَّ وَلِيْ فِيْـهِ الاَ لَــذُّا لاَطْيَـبُ

أَوْ فِيْ الْوَصَـالِ مَكَانَـةٌ مَخْصُوْصَةٌ ۝ اِلاَّ وَمَنْزِلَتِـيْ أَعَــزُّ وَاَقْــرَبُ

وَهَبَتْ لِيْ اَلاَيَـامُ رَوْنَـقِ صَـفْوِهَا ۝ فَحَلَتْ مَنَاهِلُهَـا وَطَابَ الْمُشْرَبُ

وَغَـدَوْتُ مَخْطُوْبًـا لِكُـلِّ كَرِيْمَةٍ ۝ لاَيَهْـدِيْ فِيْهَـا اللَّبِيْـتُ وَيَخْطَـبُ

اَنَـا مِـنْ رَجَـالٍ لاَيَخَـافُ جَلِيْسُهُمْ ۝ رَيْـبَ الزَّمَـانِ وَلاَيَـرَي مَـا يَرْتَـبُ

قَــوْمٌ لَهُــمْ فِيْ كُــلِّ مَجْــدٍ رُتْبَـةٌ ۝ عَلْوِيَّــةٌ وَبِكُــلِّ جَـيْشٍ مَرْكَـبُ

اَنَـا بُلْبُـلُ الاَ فْـرَاحِ اَمْـلَيْ دَوْحُهَـا ۝ طَرُبًـا وَفِيْ الْعُلْيَـاءِ بَـازٌ اَشْـهَبُ

اَضْبَحَتْ جُيُوْشُ الْحُبِّ تَحْتَ مَشْيَتِيْ ۝ طَوْعًــا وَمَهْــمَارُ امْــتَلاَ يَعْــزُبُ

اَضْــبَحَتْ لاَ امْــلاً وَلاَ اُمْنِيَّــةً ۝ اَرْجُــوْوَلاَ مَوْعُــوْرَةً اَتَرَقَّــبُ

مَاذِلْـتُ اَرْتَـعُ فِيْ مَيَـادَيْنِ الرَّضَـاءِ ۝ حَتَّــيْ رُهِبْــتُ مَكَانَــةً لاَ تَرَهَـبُ

اَضْـحَيْ الزَّمَـانِ كَحُلَّـةٍ مَرْقُوْمَـةٍ ۝ تَزْهُـوْرِ نَحْـنُ لَهَـا الطُّـوَازَ الْمَـذْبُ

اَفَلَتْ شُـمُوْسُ الاَوَّلِـيْنَ وَشَمْـسُنَا ۝ اَبَـدًا عَـلَي فَلَـكِ الْعُـلَي لاَتَغْـرُبُ

ওই কবিতাগুলোর পর তিনি বললেন, সমস্ত জীব-জন্তু মুখে দাবী করে কিন্তু উহার উপর আমল করতে পারেনা। বাজপাখি মুখে কিছু বলেনা কিন্তু আমল করে থাকে। এটার কারণ হচ্ছে, একদিকে তাঁর মকাম বাদশার হাতে আর অন্যদিকে শূন্যের মাঝে তার উড্ডীয়ন। ওই জায়গায় হযরত শায়খ আবু মুযাফ্ফর মানসূর ইবনে মুবারক রাহমতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন–

بِـكَ الـشُّهُوْرُ لِتَهْنَـيْ وَالْمَرَاقِيْـتُ ۝ بِـامَنْ بِأَلْفَاظِـهِ تَغْلَـوْا الْيَوَاقِيْـتُ

اَلْبَازُ أَنْتَ فَاِنَّ تَفْخُرْ فَلاَ عَجَبٌ ۝ وَسَـائِرُ النَّـاسِ فِي عَيْنِـيْ فَرَاخِيْـتُ

أَشُمُّ مِنْ قَدَمَيْكَ الصِّدْقِ مُجْتَهِدًا ۝ لاَنَّهُ قَدْ قُمْ مِنْ اَلْغُلْهَا الصَّبَتُ

শায়খ আবু মুযাফ্ফর তাঁর উপরিউক্তি কবিতায় হযরত আবদুল কাদের রাদিআল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ উক্তি 'আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর'-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তাঁর এ দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশক্রমে এ দাবী উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। ফলে ওই সময় সমস্ত ওলী তাঁর কামালাত (মর্যাদা)-কে স্বীকার করে নেন এবং স্বীয় গর্দান তাঁর সমীপে ঝুঁকিয়ে দেন।[৩৮]

অনেক বুযুর্গান-এ দ্বীন তো তাঁর জন্মের শত বছর পূর্বে এ ঘটনার ভবিষ্যৎ বাণী করে যান।

শায়খ সুলায়মান দাউদ ইবনে ইউসূফ বর্ণনা করেন, একদিন আমি শায়খ 'আকীল এর সান্নিধ্যে বসা ছিলাম। তখন কেউ বললো, 'বাগদাদে আবদুল কাদের নামে এক যুবক বেলায়তের রাজ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।' তখন শায়খ সুলায়মান বললেন, 'ওই যুবক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধি অর্জন করবে। এ মহান মর্যাদার অধিকারী যুবককে মালাকূত রাজ্যে 'বাজে আশহাব' বলা হয়। তিনি স্বীয় যুগে একক মর্যাদার অধিকারী হবেন। ওই যুগে তাঁর ইঙ্গিত-ইশারায় বেলায়ত দান করা হবে এবং বহিস্কার করা হবে।

গাউসুল আযমের কালাম

এক : যখন বন্ধুর সাথে মিলনের (মৃত্যুর) অন্তর সঞ্জীবনী সমীরণ ওই সব লোকের দোর গোড়ায় পৌছে- যারা মরুভূমিতে পড়ে আছে, মিলন রাতের স্মরণ যখন ওই সব লোকের স্বপ্নে আসে, যারা বিচ্ছেদের আগুনে দগ্ধ। যখন রূহ বেসালের খবর জানতে আসে এবং চোখগুলো প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের সাক্ষাত লাভের স্থলে অশ্রু বিসর্জন করে বুক ভাসায়, তখন আদমের মতো গুনাহের কথা স্বীকার করে নেয় এবং ইব্রাহীমের হিম্মতের মতো 'اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرْلِـي خَطِيْئَـتِي' 'আমি আশা রাখি (আমার রব) আমার গুণাহ ক্ষমা করবেন- এর দরজায় পা রাখে এবং মূসার এরাদার মতো 'تُبْتُ اِلَيْكَ' এর পাহাড়ের উপর হুশ হারা হয়ে যায়, আইয়ুবের মতো 'مَسَّنِيَ الضُّرُّ' এর হাতে ইশারা করে, সুলায়মানের হতবাক হওয়ার মতো اِنْ لِرَبِّكَ فِي اَيَّامِ

[৩৮]. শাহযাদা দারাশেকু তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'সফীনাতুন আওলিয়া'তে আল্লাহর ওই সব ওলীর মধ্যে কতেকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা হযরত গাউসুল আ'যম'-এর এ ঘোষণার সময় বাগাদাদের মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তারা কার্যত নিজ গর্দানসমূহ তাঁর কদমের নীচে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের নামসমূহ সফীনাতুল আওলিয়া নামক কিতাবে দেখুন।

Scanned by CamScanner

دَفْــرِكُمْ نَغْمَــاتْ এর হাওয়ায় আরোহন করে গমন করে, অন্তরের পিঁপড়া প্রতাপশালী বাদশার সেনাবাহিনী দেখে يَا اَيُّهَا النَّمَلُ اُدْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ বলে চিৎকার করে উঠে, তখন অনেক সুলূকের পথ পরিদৃষ্ট হয়- যাদের অবস্থাদি জানতে বিবেক ও চিন্তা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ওই সব অবস্থায় এমন অনেক অব্যক্ত অর্থ নিজে নিজে প্রকাশ পেতে থাকে, যার মহত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় বুঝা যায় না। কখনো তা বিজলি হয়ে চমকায়, কখনো সূর্যের কিরণ নিয়ে উদিত হয়। অন্তর ওয়াজদের দরুন চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায় এবং রূহ পিপাসায় এবং গরমের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সুতরাং হে রূহানী কাফেলা! ওই সব মানযিলের সন্ধানে বের হয়ে পড়ো। হে অন্তরের আরোহী! ওই মকামগুলো লাভ করার জন্য দ্রুতগামী হও। আর ঘোষণা করতে থাক–

﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

দুই : প্রথমে বুঝে নাও, তারপর পৃথক হও। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করা ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করে তার সংশোধনের সম্ভাবনা অনেক কম, তাকে নষ্ট করার উপকরণ অনেক বেশী। নিজের সাথে আপন আল্লাহর নূরের বাতি (ইলম) নিয়ে (আল্লাহর পথে) পরিচালিত হও।

যে ব্যক্তি ইলমের আলোতে আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ইলম দান করেন যা সে ইতোপূর্বে জানতোনা। আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর। পরজন এবং পার্থিব উপকরণ ত্যাগ কর। আল্লাহর সাথে যদি চল্লিশ দিন নিষ্টার সাথে থাক, তবে তোমার অন্তরে হিকমতের ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হবে। আল্লাহর উজ্জ্বল আগুনকে হযরত মুসার আয়মন উপত্যকার আগুনের মতো দেখতে পাবে। তখন মানব-অন্তর নাফস ও প্রবৃত্তিগুলোকে ধমকের সুরে বলবে– আমি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখেছি, আমাকে পার্থিব লিপ্সা ও উপকরণ নিজেদের দিকে মনোনিবেশ করাতে পারবে না। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হবে- 'আমি তোমার রব, আমি তোমার উপাস্য। আমার ইবাদত কর। আমার স্মরণে ইবাদত কর। অন্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আমার পরিপূর্ণ পরিচিতি লাভ কর। আমার ইলম, কুরব্ ও মিল্‌কের প্রতি মনোনিবেশ থাক। যখন অন্তরে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তখন বাক্বার মকাম অর্জন হবে। কাল্‌ব

(অন্তরে) যিকর জারী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার নূর ও ইলহাম আসতে শুরু করবে। তখন ওই ইলহাম ও নির্দেশ তেমনি হবে, যেমন ইরশাদ হয়েছে যে, 'যাও, ফিরআউনের কাছে, সে অবাধ্য হয়েছে।' হে অন্তর, নাফস ও প্রবৃত্তির ফিরআউনকে গিয়ে বল, আমার পক্ষ থেকে সুপথ প্রদর্শন কর। তাকে বল, যদি সে আমার আনুগত্য স্বীকার করে, তবে আমি তাকে সরল পথ দেখাবো।

তিন : মধুমক্ষিকারূপী 'রূহ' শরীরের অস্থিত্ব আসার পূর্বে 'কুন' (کن) এর মৌচাক থেকে উড়ে এসে 'তাওহীদ' (توحید) এর বাগানে প্রবেশ করে- যাতে মহব্বতের গাছের ফুল থেকে রস আহরণ করে এবং 'মা'রিফাত' (معرفت) এর শাখাসমূহ থেকে ফল আহার করে এবং 'مواطن قدس' এ নিজের ঘর তৈরী করে। আর 'علو' এর দরবারে 'مقام قرب' এ আল্লাহর নৈকট্যের পথসমূহ চলতে পারে। আর 'مقامات عالیہ' যখন তাকে কাযা ও কদরের (তকদীরের) শিকারী শরীয়তের অবস্থান থেকে শিকার করে 'امر' এর মধুমক্ষিকার হাত দিয়ে শরীরের পিঞ্জরে বন্দী করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মধুমক্ষিকারূপী রূহের প্রতি ওহী করলেন যে, শরীর দ্বারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর পথে চল, শরীয়তের ফল খেয়ে হাকীকতের নূরের খুশবো দ্বারা সুবাসিত হও।

চার : 'বিপদ' আ'রিফ-বান্দাদের জন্য ঈমানের প্রাণ স্বরূপ। দুঃখ ওয়াসীল-বান্দাদের জন্য রহস্যের সমীরণ। সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ আর সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে কাঙ্খিত বস্তু না পাওয়া। নিজ শক্তি প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে, তা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার নাম হচ্ছে 'হাকীক্বত-ই তাওহীদ'। প্রত্যেক কিছুকে বিবেকের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখার নাম হচ্ছে- 'তাফরীদ'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ﴾

পাঁচ : 'আল্লাহ' শব্দই হচ্ছে ইসমে আযম। দোয়া তখনই কবূল হয়- যখন তুমি আল্লাহ বলবে আর তোমার অন্তরে অন্য কারোর স্মরণই আসবে না, কামিল আরিফগণের 'বিসমিল্লাহ' বলা ওই প্রাভাব রাখে, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 'কুন' শব্দের প্রভাব রয়েছে। এ শব্দ দুঃখ দূর করে, বিপদ দূরীভূত করে, বিষকে প্রভাবহীন করে দেয়। নূর বৃদ্ধি করে।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বিজয়ীর উপর বিজয়ী। তিনি অতি আশ্চর্যের প্রকাশকারী। তাঁর রাজত্ব বিশাল। তাঁর মর্যাদা মহান। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অন্তরের রক্ষক। জুলমবাজদের উপর বিজয়ী। বাদশাগণের অহংকার ধ্বংসকারী। প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। কোন কিছুই তাঁর থেকে গোপন নেই। যে ব্যক্তি তাঁর হয়ে যায় সে তাঁর আশ্রয়ে চলে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তিনি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তাকান না, যে তাঁর পথে চলে, সে তাঁর পর্যন্ত পৌছে যায়। যে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় সে তাঁর সাথে জীবন অতিবাহিত করে। যে তাঁকে পেতে ইচ্ছা করে তিনি তাঁর সাথে মিলে যান। যে পরজন থেকে দূরে থাকে তাঁর পথ পরিস্কার হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহর দরজায় মাথা রাখ, তাঁর আশ্রয় কামনা কর।

ছয় : ওহে আল্লাহ থেকে বিমুখ লোকেরা! তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যখন তাঁর নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে 'দারুশ শিফা', তবে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা কী হতে পারে! যখন 'দারুল মিহনত' এর এ অবস্থা, তবে দারুন নিয়ামত কেমন হবে! যখন তাঁর দরজা পর্যন্ত পৌছার কারণে আমার এ মর্যাদা, তবে যখন তাঁর পর্দা তুলে দেয়া হবে তখন কী অবস্থা হবে। এ অবস্থা তখনই হবে যখন আমি তোমাকে ডেকেছি আর যখন আমি নিজ রহস্য তোমাকে বর্ণনা করবো তবে কী অবস্থা হবে।

সাত : (আল্লাহ-প্রেমিক) লোকেরা মুশাহিদায় রয়েছে আর বুযুর্গীর সমুদ্র তরঙ্গে উদ্বেলিত। আমি সত্যবাদী প্রেমিক পাখির মতো, যে শুধু গাছে বসে থাকে না বরং ভোরের নিরবতায় নিজ বন্ধুকে আহ্বান করে। যখন আশিকের হৃদয়ে নৈকট্যের সুগন্ধি পৌছে তখন সে আপন আল্লাহর স্মরণে ডুবে যায়।

আট : তোমার জন্য দুঃখ, তোমাকে মৃত্যু পেয়ে বসলো অথচ তুমি আল্লাহকে চিনতে পারনি।

নয় : বীরত্ব হচ্ছে- এক মুহূর্ত ধৈর্য ধারণ করার নাম। আল্লাহ তা'আলা কিছু আরিফবান্দাকে ওই (ধৈর্যের) শরবতের একবিন্দু পান করিয়েছেন। আর কুদ্‌রাতের সাকীকে দেখার জন্য তা পান করে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়। তখন তার রূহ নিজ সতীর্থদের মাঝে খুশীতে হেলতে-দুলতে থাকে, যেমনটি আল্লাহর তাজ্জালির বিদ্যুৎ চমকের দ্বারা মুসার পাহাড় অতি খুশীতে নড়াচড়া করেছিলো, যেন এতে সে প্রেমাস্পদের রহস্য জেনে গেলো এবং ইশকের অতিশয্যে 'আনাল হক' বলে উঠলো। তার অন্যান্য সতীর্থও বেহুশ হলো এবং সে বললো 'সুবহানী মা আযমু শানী।'

দশ : পাখিরূপী রূহের একটি দল নিজ কায়ার পিঞ্জারা ত্যাগ করলো। অনুপ্রেরণা (شَوق) এর পাখায় ভর করে ইশকের দিগন্তে উড়া শুরু করে দিলো। আর 'ওয়াজদ' এর মরু উপত্যাকা অতিক্রম করে 'আযল' (অনন্ত)-এর দিকে উড়তে লাগলো এবং চেষ্টা করতে লাগলো যে, 'তূর-ই কাদীম' থেকে মুশাহিদার খাদ্যশস্য অর্জন করার। কিন্তু ওই তলবকারী পাখির উপর আল্লাহর আযমতের বাজপাখি জাপটা মেরে বসে। এতে তারা বেহুশ হয়ে পড়ে। কিন্তু যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন সে হুশে থাকে। আমলকারীদের জন্য সর্বদা আল্লাহর জালালিয়তের রশ্মি চমকাতে থাকে আর আরিফগণের দৃষ্টির সামনে নূরের রশ্মি উদ্ভাসিত হয়। .... হে আমার মুরীদ! মানবাকৃতিতে অদৃশ্যের এক রহস্য বন্ধক রাখা হয়েছে। সেটার মাটির কায়ায় উচ্চ-মর্যাদার ভান্ডার নিহিত। যখন চিকিৎসক উহার পরিচিতি জানার জন্য ইচ্ছা করলেন এবং ওই ভান্ডারে সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন নাফস (প্রবৃত্তি)-এর পর্দাসমূহ তাকে বারণ করলো এবং সে ওই ঝর্ণাধারার কাছে যাওয়ার কোন পথ পেলো না।

হযরত গাউসুল আযমের দৃষ্টিতে হযরত মনসূর হাল্লাজ

'আরিফগণের মধ্যে একজন 'আরিফ দাবীর দিগন্ত পর্যন্ত 'আনাল হক' এর পাখা দ্বারা উড্ডীয়ন করলো, যখন অনাদির বাগিচায় নিজের কোন বন্ধু ও সহযোগী পেলেন না তখন ওই বুলি ছেড়ে দিয়ে অন্য জনের ভাষায় গান করতে লাগলো। তার এ গান গাওয়া তার জন্য মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রাথমিক স্তর ছিলো। সুতরাং তার উপর খোদায়ী শাস্তি- নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী- এর পাখনা ঝাপটালো আর 'প্রত্যেক কিছু মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদানকারী'-এর পাঞ্জা তার উপর গেড়ে বসলো। সোলায়মানরূপী শরীয়ত যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি নিজ বুলি ছেড়ে দিয়ে অন্যের ভাষায় কেন কথা বলতে ছিলে এবং এমন গান কেন গাইছো যা তোমার পক্ষে শোভা পায়না। সুতরাং তুমি নিজ অস্থিত্বের পিঞ্জারায় প্রবেশ করে সম্মান ও মর্যাদার পথ ত্যাগ কর। অসম্মানের সঙ্কীর্ণ গলীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নাও এবং তা স্বীকার করে নাও, যাতে দাবীদারগণ জানতে পারে। ওয়াজদকারী উচিত, 'এক' কে এক জানা এবং শরীয়তের কানুনকে সম্মান করার মাধ্যমে তরীকতের হিফাযত নির্ভরশীল।

ইল্‌ম অর্জন করা ফরয। মৃত নাফস্‌সমূহ তা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। কেননা, তাকওয়ার সমস্ত পথ শুধু ইল্‌ম দ্বারাই আলোকিত হয়। দলীল- প্রমাণের দিক দিয়ে ইলম অত্যন্ত অলংকারময় এবং ঈমানের সমস্ত স্তর থেকে উত্তম।

Scanned by CamScanner

মুত্তাকীদের সমস্ত স্তর থেকে উত্তম। দ্বীনের সমস্ত মর্যাদা থেকে মহান। মাহদী (পথ প্রদর্শক)-দের সমস্ত মর্যাদা থেকে উত্তম। মুজতাহিদদের সমস্ত পদবী থেকে উচ্চ ও মহান। ইলমের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য ও মা'রিফতের মকামসমূহর পরিভ্রমণে সহজ হয়। আর ইলম হচ্ছে আল্লাহর মহান সান্নিধ্যে দাঁড়ানোর মাধ্যম।

ইলহাম, ওয়াস্ওয়াসা এবং হাওয়া

যে সব কল্পনা ও ধারণা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তবে ইলহাম, শয়তানের পক্ষ থেকে হলে তা ওয়াস্ওয়াসা আর নাফসের পক্ষ থেকে হলে তা হচ্ছে হাওয়া (প্রবৃত্তি)। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধারণা আসে তা সত্য হয়ে থাকে আর ইলহাম এর চিহ্ন হচ্ছে- তা ইলমের অনুরূপ হবে। ইলমের তুলাদন্ডে পুরোপুরিভাবে যা সমান হবে না ওই ইলহাম বাতিল; প্রবৃত্তি হচ্ছে যা নাফসের তাড়নায় করা হয়। অনেক সময় নাফসের বার বার দাবীর কারণে মানুষ ধোকায় পড়ে যায় এবং নফসের তাড়নাকে ভাল মনে করে বসে।

'ওয়াস্ওয়াসা'- এর চিহ্ন হচ্ছে, উহা যখন কোন কামনার প্রতি তাড়িত করে এবং উহার বিরোধিতা করা হয়, তবে অন্য কামনা-বাসনার প্রতি তাড়িত করে। কেননা, তার কাছে সমস্ত বিরোধী শক্তি সমান। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

ইলহামগত কল্পনার ধরণ হচ্ছে, তা দ্বারা মন্দ সৃষ্টি হয় না বরং ইলমের মধ্যে বৃদ্ধি সাধন করে। এর আস্বাদান তখনই পুরোপুরি বুঝা যাবে যখন মানুষ তা মত আমল করবে। অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সত্য জ্ঞান অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী[৩৯] বলেন, 'ইলহাম' সমস্ত শক্তি থেকে শক্তিশালী। কারণ যদি তা অর্জিত হয় তবে অন্তরধারী ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আর এটা হচ্ছে ইলমের স্থান।

---

৩৯. আবূ কাসিম সায়্যিদুত তা'য়িফা শায়খ জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বহু উপাধীর অধিকারী বুযর্গ ছিলেন। সায়্যিদুত তা'য়িফা, তা'উসুল ওলাম, হাওয়ারী-রী, যুজাজ এবং খায্যার ইত্যাদি খিতাবে তাঁকে ডাকা হয়। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে জুনাইদ, তিনি মুক্তা বিক্রেতা ছিলেন। তাঁর আবাসভূমি ছিলো নিহাওয়ান্দ কিন্তু হযরত জুনাইদের জন্ম হয় বাগদাদে। তিনি সুফিয়ান সূরীর প্রবর্তিত তরীকতের অনুসারী ছিলেন। হযরত সাররী সকতীর ভাতিজা ও মুরীদ ছিলেন। বড় বড় শায়খগণ তাঁর 'কামালাত' এর স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি আহলে সাফাদের ইমাম ও স্বীয় যুগের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হারিস মুহাসিবী ও মুহাম্মদ

ইবনে আ'তা বলেন, ইলম স্বয়ং একটি বড় শক্তি। তা ইলহামের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বৃদ্ধি পায়।

ইবনে খাফীফ[৪০] বলেন, ইলহাম ও ইলম- উভয়ই এক ধরনের- যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। যদি বিভিন্ন কল্পনা হৃদয়ের মধ্যে জাগরিত হয় তবে তরীকত পথের যাত্রীর উচিত এ দোয়া পাঠ করা–

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾

তাসাউফপন্থীরা এ কথার উপর একমত যে, যে ব্যক্তি হারাম খায় সে তরীকতের মনযিলসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। যখন তুমি নাফ্সের সাথে ঐক্যমত পোষণ করবে, হারাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। যদি তুমি নাফসের সাথে একমত পোষণ করো, তবে তুমি এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকবে। তোমার আহার সন্দেহযুক্ত হবে। যখন তোমার অন্তর পরিস্কার থাকবে, তখন 'হালাল' সহজলভ্য হবে।

* স্থায়ী জীবনের নিয়ম-পদ্ধতি দৃষ্টির সামনে রাখার চেয়ে অস্থায়ী জীবনের নিয়ম-কানুন দৃষ্টির সামনে রাখা বেশী প্রয়োজন। হে বৎস! তোমার উচিত সত্য ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করা। কেননা, এ দু'টি গুণ অর্জিত না হলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

* দুনিয়াতে রোযা না রাখলে, পরকালে 'শরাব-ই লুকাত' দ্বারা ইফতার করা সম্ভব হবে না।

* কিয়ামত দিবসের হিসাব নেওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম নিজের নাফসের হিসাব নিজে কর আর পরকালে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কারণ দুনিয়া এমন এক বাস্তব স্থান যার মাধ্যমে কিয়ামতের সেতু দিয়ে গমন করতে হবে। আর ওই সময় হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন।

কাস্সাব'এর মতো তরীকতের শায়খ তাঁর সাহচর্যে থাকতেন। তরীকতের জগতে তাঁর প্রতিটি কথা সনদের মর্যাদা রাখে। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তরীকতের ইমাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায়। 'কাশফুল মাহজুব' প্রণেতা খাজা আলী হাজভিরী তাঁর তরীকতদর্শনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ২৯৭ হিজরীর ২৭ ই রজব শনিবার ওফাত বরণ করেন। বাগদাদে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

৪০. হযরত শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে খাফীফ শিরাজের সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন নিজ যুগের কুতুব, তরীকতপন্থীদের নেতা ছিলেন। হযরত রুয়াম (রহঃ) এর মুরীদ, হযরত হুসাইন ইবনে মানসুর হাল্লাজের সহপাঠি এবং শাফি'ঈ মাযহাবভুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। হাকীকীয়া সিলসিলাহ্ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ৩৭১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 'আযর' শহরে তাঁর মাযার বিদ্যমান। (সফীনাতুল আওলিয়া কৃত দারাশেকূ)

Scanned by CamScanner

* এক মুহূর্তের আমল হচ্ছে 'যুহদ', দু'মুহূর্তের আমল হচ্ছে 'ওয়ারা' আর সর্বদা আমল করার হচ্ছে 'মারিফাত'। ওই সব বান্দাদের সৌন্দর্যসমূহ শুধু আল্লাহরই, যাদেরকে তিনি নিজ দয়াগুণে তাঁর সমীপে আহ্বান করেছেন।

* যখন 'ফযলের আহ্বান' 'মজলিস-ই ওয়াসল'কে আহ্বান করলো, তখন কোন পথপ্রদর্শক তাকে আল্লাহর নৈকট্যে নিয়ে গেলো। সেখানে সে 'মুতালিয়াই আযল' দ্বারা 'ফিল-ই জামাল'কে দর্শন করলো এবং হলল (حلل) এর তারকা দ্বারা আল্লাহর জালালকে দেখলো।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের কোন একজন নবীর প্রতি ওহী করলেন যে, আমার এমন অনেক বান্দা আছেন, যারা আমার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন এবং আমি তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব রাখি। তাঁরা আমার প্রতি ভালবাসা রাখেন, আমিও তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখি। তাঁরা আমাকে স্মরণ করেন, আমিও তাঁদেরকে স্মরণ করি। তাঁরা আমার প্রতি তাকান, আমিও তাঁদের প্রতি তাকাই। ওই নবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! ওই সব লোককে কিভাবে চিনবো? আল্লাহ বললেন- তাঁরা সূর্যাস্তের জন্য তেমনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে, যেমন বেলা শেষে পাখিরা তাদের নীড়ে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন রাত নেমে আসে, চতুর্দিকে অন্ধকার ছেঁয়ে যায়, তাঁরা বিছানা পাতে। বন্ধ যেমন নিজ বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে, তেমনি এ সব লোকও সমস্ত আরাম এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সাজদায় নিজেদের মাতা নত করে, প্রার্থনার জন্য হাত বাড়ায় এবং আবেগজড়িত কণ্ঠে আমাকে ডাকে, আমি তাঁদের আহজারী শুনি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দরদ ভরা কণ্ঠে কান্নাকাটি করে কতেক মুশাহিদা করে, কতেক অভিযোগ পেশ করে। কেউ সারা রাত দাঁড়িয়ে, কেউ বসে বসে, কেউ রুকুতে, কেউ সাজদায় আমাকে স্মরণ করে। আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট তাঁরা ভোগ করে, আমি সব কিছুই দেখি, আমার প্রতি ভালবাসার কারণে যে জিনিষের তারা অভিযোগ করে, আমি তা শুনি। প্রথমে তাঁদের অন্তরকে নূরের তাজাল্লি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিই। তারপর তাঁরা আমার সংবাদ দিয়ে থাকে, যেভাবে আমি তাঁদের খবর দিয়েছি। ... তারপর তাঁদেরকে এমন ইলম দান করি, যা পাওয়ার জন্য তাদের চিন্তা-ভাবনায় কোনদিন ছিল না। হে ভ্রাতা! তোমাদের উচিত, এমন সব লোককে সন্তুষ্ট করা। হয়ত এর বরকতে তুমিও তাঁদের দলের মধ্যে গণ্য হবে এবং নিজ ইচ্ছাকে তাঁদের আনুগত্যশীল কর, তবে সৌভাগ্যের উচ্চ মর্যাদায় পৌছতে পারবে।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমাদের চক্ষু-যুগলকে হিদায়তের নূর দ্বারা উজ্জ্বল করুক এবং আমাদের আকীদার ভিতকে সুদৃঢ় করুক।

উপদেশের দোয়া

হযরত গাউসুল আযম রাদিআল্লাহু আনহু বক্তৃতার প্রারম্ভে এ দোয়া করতেন। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يَصْلِحُ لِلْعَرْضِ عَلَيْكَ اِيْقَانًا نَقِفُ بِهٖ فِي الْقِيَامَتِهِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعِصْمَةً تُنْقِذُنَا بِهَا مِنْ وَّرَطَاتِ الذُّنُوْبِ وَرَحْمَةً تَطَهَّرْنَا بِهَا مِنْ دَنَسِ الْعُيُوْبِ عِلْمًا نَفْهِمْ بِهِ اَوَامِرَكَ وَنَوَاهِيْكَ وَفَهْمًا نَعْلَمُ بِهِ كَيْفَ تَنَاجِيْكَ وَاجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مِنْ اَوْلَيَاءِكَ وَامْلاَءِ قُلُوبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَالْحُلَّ عُيُوْنِ عُقُوْلِنَا بِاَثْمَدِ هَدَاتَيِكَ وَاَحْرُسُ اِقْدَامُ اَفْكَارِنَا مِنْ مَزَالِقِ مَوَاطِهِي لِمَزَلاَّتِ الشُّهُبَاتِ وَاَمْنَعُ طُيُوْرُ نُفُوْسِنَا مِنَ الْوُقُوْعِ فِي شَبَّاكِ مَوْبِقَاتِ الشُّبْهَاتِ وَاَمِنَّا فِي اَقْيَامِ الصَّلَوَتِ عَلَي تَرْكِ الشَّهَوَاتِ وَاَصَحُّ سُطُوْرَ سَيِّئَاتِنَا عَنْ جَرَائِدِ اَعْمَالِنَا بِاَيْدِي الْحَسَنَاتِ كُنْ لَنَا حَيْثُ يَنْقَطِعُ عَنْ جَرَائِدِ اَعْمَالِنَا بِاَيْدِي الْحَسَنَاتِ كُنْ لَنَا حَيْثُ تَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ مِنَّا اِذَا اَعْرَضَ اَهْلَ الْوُجُوْهِ بِوُجُوْهِهِمْ عَنَّا حَتَّي تَحْصُلُ فِي ظُلْمِ اللُّحُوْدِهَا.

اَفْعَالَنَا اِلَي يَوْمَ الْمَشْهُوْدِ اَجِرْ عَبْدَكَ الضَّعِيْفُ عَلَي مَا اَلَّفَ مِنَ الْعِصْمَةِ عَنْ اللزَّلَلِ وَنَقِّهُ وَالْحَاضِرِيْنَ نُصَالِحُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَاَجِرْ عَلَي لِسَانِهِ مَايَنْتَفِعُ بِهِ اَسَّامِعُ وَتَذْرِفُ لَهُ الْمَوَامِعُ وَلَيِّنْ لَهُ الْقَلْبُ الْخَاشِعُ وَاغْفِرْلَهُ وَلِلْحَاضِرِيْنَ وَالْجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ اٰمِيْنَ.

কখনো কখনো তিনি এ দোয়াও বক্তৃতার শুরুতে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحِ الْاِمَامَ وَالْاُمَّةَ وَالرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَادْفَعْ شَرَّ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ فِي جَمِيْعِ الْوَقَاتَ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَالِمُ بِسَرَائِرِنَا فَاَصْلِحْنَا وَاَنْتَ الْعَالِمُ بِذُنُوْبِهَا فَاغْفِرْهَا لَاتَرَانَا حَيْثُ نَهَيْتَنَا وَلَاتَفْقِدْنَا حَيْثُ اَمَرْتَنَا وَاَعِزْنَا بِالطَّاعَةِ وَلَاتُذِلَّنَا بِالْمَعْصِيَةِ وَاَشْغِلْنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَاقْطَعْ مِنَّا كُلَّ قَاطِعٍ لَقَطَعْنَا عَنْكَ وَعَنْ هَوَاكَ اَلْهِمْنَا ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَمَاشَاءَ اللهُ كَانَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

لَاتُخَيِّبْنَا فِي غَفْلَةٍ وَلَاتُمِتْنَا فِي غَزَّةٍ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ اَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Scanned by CamScanner